বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম

১৪ রমজান, ২০২৪

২৫ মার্চ, ২০২৪

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের জীবনকে সুন্দর করে দেন, বেশি বেশি তাঁর পছন্দমত কাজ করার সুযোগ দেন সেই আশায় এই লিখনী শুরু করলাম।

মহান আল্লাহ যাকে ভালবাসেন তাকে দিয়ে দুনিয়াতে নেক কাজ করার তোউফিক দান করেন। তেমনি একজন ব্যক্তি কাজি আব্দুল খালেক (রতন)। গোহাইলবাড়ি গ্রাম যখন দারিদ্রতায় চরম নিমজ্জিত ছিল, সুদের টাকা পরিশোধ না করতে পারায় আত্মহত্যার মতন ঘটনা ঘটেছিল, যখন অশিক্ষা এবং কুসংস্কার, শির্কি কাজ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল, যখন দারিদ্রতার কারণে ঈমানের উপর টিকে থাকা মুছলমানদের জন্য কঠিন হয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখন একজন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ যোগ্যতা দান করলেন তিনি কাজি আব্দুল খালেক (রতন)। তবে গ্রামের মানুষের কিছু কিছু অভ্যাস ছিল খুবই ভাল তাহলো ভদ্রতা, বিনয়-নম্রতা, অল্পেই খুশি হওয়া, হাসি খুশি থাকা, ঝগড়া-বিবাদ না করা, পরস্পর্ সম্মান প্রদর্শন করা, মানুষকে আপন করে নেওয়া ও পরিশ্রমী। এসব গুনের কারনে এসব মানুষ দ্রত উন্নতি করতে সক্ষম হন।

দারিদ্রতা দূর করার পাশাপাশি গ্রামের মানুষের উন্নতির জন্য তিনি যেসব প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন সেগুলো নিম্নরুপঃ

শিক্ষার চেস্টা, বাসস্থান এর ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান এর ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, শির্ক ও বিদআত এর বিপক্ষে অবস্থান, সুদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপ,নামাজ প্রতিষ্ঠার চেস্টা, সুদবিহীন সহজ কিস্তিতে লোন প্রদান, তাৎক্ষনিক সাহায্য, মাসিক নিয়মিত সাহায্য ইত্যাদি।

এসব কাজ তিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় নিরলসভাবে এবং কোনরুপ নাম জৌলুসের বা প্রচার ছাড়াই দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন।

ইনশাআল্লাহ এই লিখার মাধ্যেম আমরা বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের মানুষের কাছে একটি আদর্শ নমুনা হিসাবে তাঁর কাজকে তুলে ধরার চেস্টা করবো যাতে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশসহ বাংলাদেশের আনাচে কানাচে এবং এরুপ বিভিন্ন সমস্যায় নিমজ্জিত মানুষের জন্য যারা একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে চান তাদের জন্য পথ খুলে যায়। তবে যদি কেউ লোক দেখানোর জন্য বা দুনিয়াতে কিছু পাওয়ার জন্য এই কাজ করতে চান তাদের খুব লাভ হবেনা।

কারন যারা লোক দেখানোর জন্য কাজ করবে তারা এক সময় ক্লান্ত হয়ে এই কাজ ছেড়ে দিবে। কিন্তু যারা মহান আল্লাহর কাছে থেকে পুরস্কার পাওয়ার আশায় করবে তাদের কেউ সমালোচনা বা দুর্নাম করলেও তারা ক্লান্ত হবেনা।

মানুষের মনে আল্লাহর উপর ভরসা এবং অদম্য সাহস থাকলে একটি গ্রামের এরুপ পরিবর্তন করা সম্ভব তাঁর উদাহারণ তিনি। তিনি তাঁর স্বপ্ন পুরনের জন্য আজও চেস্টা করে যাচ্ছেন।

সুচিপত্র

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় নতুন প্রজন্মকে ভাল কাজে উৎসাহ দেওয়া, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের সম্পদশালী লোকদেরকে ভাল কাজের উৎসাহ এবং পথ দেখানো, মুছলমানদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার চেস্টা করা

কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এর উন্নয়নমুলক কাজ সম্পর্কে গবেষণাঃ

১। দারিদ্রতা দূরীকরণ

২। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা (গরু, রিক্সা, সেলাই মেশিন, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি)

৩। শিক্ষার উন্নয়ন (প্রাথমিক শিক্ষা, হাই স্কুলের শিক্ষার জন্য মাসিক সাহায্য)

৪। সুদবিহীন ঋন প্রদান (সুদের ভয়াবহতা সম্পর্কে মানুষদেরকে সতর্ক করে সুদহীন ঋন প্রদান)

৫। তাৎক্ষনিক সাহায্য (প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ যেকোন দুর্ঘটনায় সাহায্য)

৬। খাদ্যের ব্যবস্থা (গ্রামের প্রায় প্রতিটি ঘরে খাবার পৌছানো যাতে কেউ না খেয়ে না থাকে)

৭। বাসস্থানের ব্যবস্থা

৮। মাসিক বা নিয়মিত সাহায্য

৯। স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য বিনামুল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থাঃ

ইসলামী আকিদা প্রতিষ্ঠায় কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এর চেস্টা

১। নামাজ প্রতিষ্ঠার চেস্টা

২। মসজিদে সাহায্য প্রদান

৩। আল-কুরআনসহ বিভিন্ন ইসলামিক বই হাদিয়া দেওয়া

৪। শির্ক, বিদআত, কুসংস্কার, ভন্ড পীর, গান-বাজনা, কবর পুজাসহ অন্যান্য ইসলাম বিরোধী কাজের বিরুদ্ধে অবস্থান

৫। সবসময় গ্রামের খোঁজ খবর নেওয়া

৬। মুছলমানদের অগ্রাধিকার দেওয়া

৭। কুরবানীর ঈদে নিয়মিত গরু কুরবানী করা, রমাজানসহ বিভিন্ন সময় নিয়মিত সাহায্য

আমাদের দেখা ১৯৯০/১৯৯৫ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত গোহাইলবাড়ি গ্রামের চিত্রঃ

১। গ্রামের প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক অবস্থাঃ ——————————————————————————————

২। তৎকালীন যারা মরহুম হয়ে গেছে গোহাইলবাড়ি গ্রামের বিভিন্ন মানুষঃ——————————————

৩। গ্রামের মানুষের জীবনে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থাঃ----------

৪। গ্রামের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় কুসংস্কারঃ----------

৫। বন্যায় গ্রামের চিত্রঃ (কলা গাছের ভেলা, সমস্ত গ্রাম ডুবে যাওয়া, খাদ্যের অভাব)

৬। নালী বাজারে হাটের দিন ও গোহাইলবাড়ি গ্রামবাসীঃ

৭। বিভিন্ন রকমের পেশার মানুষঃ ( কৃষি কাজ, সবজি বিক্রি, মাটি কাটা, হকারি করা, নৌকার ব্যবসা, মাছ ধরা, ফলমুল বিক্রি করা, গান গাওয়া )

৮। শীত,বর্ষা, গ্রীষ্ম ঋতুতে গ্রামের অবস্থাঃ

৯। ঈদ, রোজা, নামাজ ইত্যাদির অবস্থাঃ

.১০। আমোদ-প্রমোদ (টিভি, রেডিও, যাত্রা, নাটক, খেলাধুলা), নম্রতা-ভদ্রতা, হাসি খুশি, ঘর জামাই,মারফতি গান, পীরদের আগমন, অতিথি পরায়নতা, সরলতা, গীবত, চোগলখুরী, ঝগড়া বিবাদ, কুসংস্কার ইত্যাদি)

১১। খাদ্য অভ্যাস, পোশাকঃ ডাল-ভাত, আলু ভর্তা, বিভিন্ন শাক সবজি এলাকায় এমনিতেই জন্ম নিত যেমন, কচু, কলার থর ইত্যাদি

১২। গোহাইলবাড়ি গ্রামের আশে-পাশের উল্লেযোগ্য বাজার, স্কুল, ইছামতি নদী, পদ্মা নদী, সয়দাবাদ মসজিদ, ও কয়েকটি গ্রামের অবস্থাঃ

গোহাইলবাড়ি গ্রামের বর্তমান (২০২৪/২৫) অবস্থাঃ

১। ভৌগিলিক অবস্থাঃ

২। বাড়ি ঘরঃ

৩। শিক্ষাঃ

৪। পেশাঃ

৫। মসজিদঃ

৬। ইসলামিক আকিদাঃ

গোহাইলবাড়ি গ্রামে বর্তমান আছেন এমন ব্যক্তিদের কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এর তৎকালীন নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে ইন্টারভিউঃ

বর্তমান সময়ে দায়িত্ব পালনকারীঃ জুমাত আলী, শফি (ইখলাছ উদ্দিনের ছেলে)

কাজি আব্দুল খালেক (রতন) থেকে সাহায্য নিয়ে উপকৃত হয়েছে এমন ব্যক্তি জীবিত বা মৃত ব্যক্তিঃ

গোহাইলবাড়ি গ্রামের এত দীর্ঘ সময়ে উন্নয়নের জন্য লেগে থাকার পিছনে কারনঃ

কাজি আব্দুল খালেক (রতন)ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

আগামী ২০ বছর পরে গোহাইলবাড়ি গ্রাম সম্পর্কে স্বপ্নঃ

কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এর ব্যক্তিগত তথ্যঃ

জন্মঃ

পড়াশুনা

মুক্তিযুদ্ধে অবদানঃ

ভাই-বোনঃ

পিতা-মাতাঃ

গোহাইলবাড়ি গ্রামের স্মৃতিঃ

কাজী পরিবারঃ

ঢাকার বাসা সম্পর্কে স্মৃতিঃ

লন্ডনে গমনঃ

বিয়েঃ

পেশাঃ

গ্রাম সম্পর্কে লন্ডনে বসে পরিকল্পনাঃ

জীবনের কিছু গুরুত্বপুর্ন ঘটনাঃ

সন্তানাদিঃ

কিছু পরামর্শ নতুন প্রজন্মের জন্যঃ

কিছু পরামর্শ বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন সম্পদশালী লোকদের জন্যঃ

শেষ ইচ্ছাঃ

বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম

ভূমিকা

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) মুছলমানদেরকে সতর্ক করেছেন যে, ক্রমাগত দারিদ্রতা মানুষকে কুফুরের দিকে নিয়ে যায়। অর্থাৎ দারিদ্রতার কারনে মুমিন বান্দা একসময় ঈমান হারা হয়ে যায়। আর ঈমান হারিয়ে কুফুরে লিপ্ত হতে হয়। আজও সারা দুনিয়াতে বিশেষ করে গরীব মুছলমান দেশগুলোতে খ্রিষ্টান মিশনারীর মত বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান প্রথমে গরীব মুছলমানদেরকে টার্গেট করে বিভিন্নভাবে আর্থিক সহযোগিতা দিতে থাকে। তারপরে খ্রিষ্টান হওয়ার জন্য প্রস্তাব দেয়। গরীব মানুষেরা এদের ফাঁদে পড়ে  বাধ্য হয়ে মহান আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম ছেড়ে কুফুরীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এর পিছনে সবচাইতে বড় কারন হল দারিদ্রতা। দারিদ্রতা সহ্য করতে না পেরে নিজের ঈমানকে বিক্রি করে দিচ্ছে আজও বহু দেশের বহু মানুষ।

আমাদের গ্রামে গোহাইলবাড়ি গ্রামে দারিদ্রতা ও অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে কিছু এনজিইও ঋন দিয়ে সুদের ফাদে ফেলে কেরে নিচ্ছিল সাধারনণ মুছলমানদের শান্তির ঘুম। কিস্তির টাকা প্রথমে ভাল লাগলেও ধীরে ধীরে চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে যাওয়া ঋন শোধ করা কঠিন হয়ে পরে সাধারণ ও সহজ সরল মুছলমানদের। তারা যেন থেই হারিয়ে ফেলে এই ঋন শোধ করতে যেয়ে। একদিকে ঐ নগদ টাকা পেয়ে আনন্দে বেহিসাবী খরচ করা শুরু করে। অন্যদিকে সুদের টাকার দ্বারা ব্যবসা বানিজ্যতে পর্যাপ্ত লাভের ব্যবস্থা না হওয়ায় ব্যবসার মূলধন ক্রমষ শেষ হতে থাকে। এনজিও এর লোকদের কিস্তির টাকা চাপ অর্থাৎ সময়মত কিস্তির টাকা পরিশোধ করার ভয় রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছিল মানুষদের।

নুন আনতে পানতা ফুড়ায় অবস্থা ছিল অধিকাংশ মানুষের। প্রতি নিয়ত দারিদ্রতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এরসাথে আছে অসুখ-বিসুখ, ঝড়, বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগের ভয়। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল গ্রামের শিশুরা। হাতে গোনা কয়েকজন লোকের বাচ্চারা স্কুলে পড়াশুনা করতো। তাও প্রাথমিক শিক্ষার পরে হাই স্কুলের পড়াশুনা করা শিক্ষার্থী ছিলনা বললেই চলে। প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত পড়েছে এদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। অল্প বয়সে বাবার সাথে বিভিন্ন পেশায় লিপ্ত হয়ে যেত বাচ্চারা। খাদ্য হিসাবে ভাত, রুটি, শাক সবজি, মাছই প্রধান ছিল। গ্রামের পাশে ইছামতি নদী এবং গ্রামের পশ্চিম পাশে খাল থেকে মাছ ধরে খেত অনেকেই। মুরগীর গোস্ত সাধারণত কোন অনুষ্ঠান বা আত্বীয় স্বজনের আগমন ছাড়া তেমন ব্যবস্থা হতনা। গরুর গোস্ত দুর্লভ ছিল।  এছাড়া গ্রামের পশ্চিম পাশের চক থেকে বিভিন্ন শাক-সব্জি পাওয়া যেত। নিজেদের বাড়িতে পুইশাক, কাঁচামরিচ, বেগুনসহ কিছু সবজি চাষের চেস্টা করতো কেউ কেউ। বর্ষাকালে পুরো গ্রাম পানি দ্বারা ডুবে যেত। নৌকা ছিল হাতে গোনা ২/১ জনের। তবে যাদের নৌকা আছে তারা একে-অপরকে সাহায্য করতো। কলা গাছের ভেলা, কাপড় ভিজিয়ে বা সাতড়িয়ে চলাচল করা, গ্রামের মধ্যে বাঁশের পুলের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ছিল বর্ষার সাধারণ চিত্র। ঝড়ের দিনে বাড়ি-ঘরের চাল উড়ে যেত কখনও কখনও। এসব ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

## ১। দারিদ্রতা দুরীকরনে পদক্ষেপঃ

কাজি আব্দুল খালেক (রতন) লন্ডন থেকে গ্রামে ফিরলেই গ্রামের মানুষদেরকে নিয়ে একজায়গায় বসতেন। তাদের সাথে পরামর্শ করতেন কি করা যায়। সবাই মন খুলে যার যার সমস্যার কথা বলতেন।

অনেক সময় বাড়ি মানুষ দ্বারা ভরপুর হয়ে যেত। অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা চলতো। গ্রামের তৎকালীন মুরুব্বীরা বা মাতবাররা বিভিন্ন অবস্থা তুলে ধরতেন।

প্রথম দিকে রতন মামা নগদ টাকা দেওয়া শুরু করলেন। গ্রামের সবচাইতে যারা গরীব তাদের তালিকা করে নগদ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।




(জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন সরাসরি গ্রামের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য তৎকালীন সময়ে)

কখনও নিজে ঐসব গরীব লোকদের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ খবর নিতেন। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, যুবক-বয়স্ক মানুষ সবার সাথে তিনি কথা বলতেন। গ্রামের মানুষদের কস্ট, বেদনা সরাসরি দেখে সাহস দিতেন সাথে নগদ আর্থিক সাহায্য যাতে না খেয়ে কেউ যেন মরে না যায়।

গ্রামের অধিকাংশ মানুষের অবস্থা এরকম ছিল। তবে এরমধ্যেও কিছু মানুষের জমিজমা ছিল যাদের সংখ্যা উল্লেখ করার মতন নয়। তাদের জমিজমা থাকলেও সঠিকভাবে চাষ না করতে পারায় তারাও অস্বচ্ছল ছিল বলা যায়। যেমন মরহুম হোসেন চাচা (আওলাদ ভাই, রাজা ভাই এর পিতা), আব্দুল মজিদ ও আহাম্মদ ভাই এর পিতা মরহুম আকবর মামা। ২/১ জন চাকুরিজীবি লোক ছিল তারা কখনও আর্থিক সহযোগিতার জন্য কার কাছে কিছু চাইতোনা। যেমন আব্দুল জলিল (মাসুদ, শাহ আলম এর পিতা)।




গোহাইলবাড়ি গ্রামে মোট তখন খালের এপার ও ওপার দিয়ে প্রায় ১২০/৩০টি মুছলিম পরিবার ছিল। তিনি ১৯৯৩/৯৪ সালে এই পরিবারগুলোকে টার্গেট করে তালিকা করে তাদের সাহায্য করা শুরু করলেন।

২। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা (গরু, রিক্সা, সেলাই মেশিন, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি)

দারিদ্রতা ছিল গোহাইলবাড়ি গ্রামের প্রধান সমস্যা। তিনবেলা পেট ভরে খেতে পারা মানুষের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা অল্প কিছু মানুষ। এছাড়া অধিকাংশ মানুষ নিশ্চিন্তে কখনই দিন অতিবাহিত করতে পারতোনা। সব সময় অভাবের ভয় চোখে-মুখে বিরাজ করতো।

কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এসব সমস্যার সমাধান হিসাবে নগদ টাকা/চাল ডাল দেওয়া শুরু করলেন। কিন্তু দেখা যেত অতি দ্রুত ঐ টাকা শেষ হয়ে যেত, এরপরে আবার খাদ্যের অভাব। তাই তিনি কিভাবে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা যায় বা যার যার পেশাকে আরো সফল করা যায় সেই চিন্তা করতে লাগলেন। এর প্রেক্ষিতে নগদ টাকার পরিবর্তে এমন কিছুর ব্যবস্থা করতে চাইলেন যেন তারা নিজেই নিজেদের পেশাগত কাজে আরো দক্ষ হয়, পেশাকে আরো শক্তিশালী করে আয় রোজগার বাড়াতে পারে।



কাজি আব্দুল খালেক (রতন) তাঁর এই পরিকল্পনা সম্পর্কে ২০১০ সালে একটি ইন্টারভিউ দিচ্ছিলেন। ১৯৯৪ সালে থেকে এই কার্যক্রম শুরু করেছিলেন যা এখনও চলছে।

যেমন কারো যদি একটি গরু থাকে তাহলে তাকে আরো একটি গরু কিনে দিলে তাঁর আয় রোজগার বেড়ে যাবে। সে আরো পরিশ্রমী হবে, কাজে গতি আসবে, দিনশেষে আয় বাড়বে, ঘরে পর্যাপ্ত খাবার আসবে। যেমন গ্রামের রতন এর পিতা আফছার ভাই, লুতফর ভাই এর পিতা মরহুম মোনছের আলীসহ অনেকেই। উনারা সহজ কিস্তিতে লোন নিয়ে গরু কিনে পালা শুরু করেন। গরুর ঘাস চক থেকে কেটে এনে খাওয়াতেন। গরুর দুধ বিক্রি করে কিস্তি দিতেন আর গরু বড় হলে বিক্রয় করে আবার নতুন বাছুর কিনে এনে পালা শুরু করতেন।



গ্রামের যারা গরু পালনে অভ্যস্ত তিনি তাদের জন্য গরু কিনে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং সহজ ও সুদমুক্ত কিস্তিতে লোন পরিশোধ করার সিস্টেম চালু করেছিলেন। (২০১০ সালের তোলা ছবি, যদিও এ কার্যক্রম ১৯৯৪/৯৫ সাল থেকে শুরু হয়েছিল।)

গ্রামের মানুষদের হাঁস মুরগী ও ছাগল পালনের অভ্যাস ছিল। যেহেতু গ্রামের পূর্ব পাশে ইছামতি নদী এবং পশ্চিমে ছিল খাল। এই নদীতে শামুক, ঝিনুক কুড়িয়ে এনে হাঁসের খাবারের ব্যাবস্থা করা যেত। তাই হাঁস মুরগী পালন একটি লাভজনক ও সহজ কাজ ছিল। হাঁস মুরগীর ডিম বিক্রি করে বা হাঁস মুরগীর নালী বাজারে বিক্রি করে আয় রোজগারের ব্যবস্থা হত।

ছাগল পালনও সহজ ছিল। কারন গ্রামে প্রচুর ঘাস পাওয়া যেত। এছাড়া গ্রামের পশ্চিম পাশে ছিল বিরাট চক। চক থেকে ঘাস কেটে এনে লোকজন গরু, ছাগল সহজেই পালন করতো।



(গ্রামের মানুষের এখনও ছাগল পালনের অভ্যাস রয়েছে।)

গ্রামের মানুষের সবচাইতে সুন্দর একটি গুন ছিল সেটা হল ভদ্রতা, নম্রতা এবং বড়দেরকে সম্মান করার গুন। কাজি আব্দুল খালেক (রতন) কে সবাই খুব সম্মান করতো। উনি যা বলতেন সেটাকে সবাই মেনে নিত। আরেকটি বড় গুন ছিল- পরিশ্রমী স্বভাবের গুন। অর্থাৎ উৎসাহ দিলে তাদের দ্বারা অনেক পরিশ্রমী কাজ করানো যেত।

অল্প কিছু লোক সেলাই মেশিন চালানোর কাজ জানতো। তাদেরকেও তিনি সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। সেলাই মেশিন দ্বারা মেয়েরা ঘরে বসেই কাপড় সেলাই করে জামা, পায়জামা ইত্যাদি বানিয়ে গ্রামের মধ্যে বিক্রয় করতো। যারা মেশিন চালাতে পারতো তাদেরকে তিনি অন্যদেরকেও শিখানোর ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন।

তৎকালীন সময়ে (১৯৯৪/১৯৯৫) সালে ভ্যান বা রিক্সার অনেক দাম ছিল। খুব কম সংখ্যক লোক নিজে কিনে ভ্যান বা রিক্সা চালাতে পারতো। অধিকাংশ রিক্সাওয়ালাকে ভাড়ায় রিক্সা চালাতে হত। অর্থাৎ দিনে কন্টাক্ট ছিল আনুমানিক ৫০ টাকা রিক্সার মালিককে দিতে হবে বাকি টাকা তাঁর থাকবে। এতে ঐ রিক্সাওয়ালার পরিশ্রমের অধিকাংশ টাকা রিক্সার মূল মালিকের কাছে চলে যেত। এই ধরনের পেশার লোক গ্রামে খুব অল্প ছিল। কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এদেরকে রিক্সা বা ভ্যান কিনে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন তবে সহজ এবং সুদমুক্ত কিস্তিতে।



গ্রামের এবং গ্রামের বাইরের অনেকের জন্যই রিক্সা কিনে দিয়েছিলেন, সহজ কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

গ্রামে ঐ সময় কিছু মানুষ হকারি করে শিবালয় বাজারে ফলমূল বা খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করে সংসার চালাত। তিনি তাদেরকেও সহজ শর্তে লোন দেওয়া শুরু করলেন যাতে তাদের রোজগার বাড়ে এবং স্বাবলম্বী হয়।

অনেকের জমি ছিল কিন্তু টাকার অভাবে সঠিকভাবে চাষ করতে পারতোনা; এসব লোকদেরকেও চাষ করার ব্যাপারে উৎসাহ এবং সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়।



(২০১০ সালে তোলা গোহাইলবাড়ি গ্রামের একটি ধান ক্ষেতের ছবি। এই ক্ষেতটি কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এর। প্রতি বছর গ্রামের মানুষদেরকে সহজ শর্তে চাষ করার অনুমতি দান করেন। বর্তমানে (২০২৪) এখানে ভূমিহীন মানুষদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করার চেস্টা চলছে।)

নালী বাজারে বা এর আশে পাশে থেকে গোহাইলবাড়ি গ্রামের মানুষ হাটের দিন বিভিন্ন জিনিস পাইকারি দামে ক্রয় করে নিয়ে ঝিটকা বা শিবালয়ে নিয়ে খুচরা বিক্রি করতো। এসব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরকে তিনি সহযোগিতার ব্যবস্থা করেন। পেয়ারা, পেঁপে, আখ ইত্যাদি গ্রাম থেকে বা নালী বাজার থেকে কিনে কিছু মানুষ শিবালয়ে অর্থাৎ আরিচা ঘাটে নিয়ে বিক্রি করতো। আরিচা ঘাট তখন খুব ব্যস্ত একটি এলাকা ছিল।

প্রচুর গাড়ি আসা যাওয়া হত আরিচা ঘাট দিয়ে। এসব গাড়ির যাত্রীদের কাছে ভাল দামে এসব খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করা যেত। আমাদের গ্রামের অনেক মানুষ তখন সরাসরি আরিচা ঘাটে গিয়ে হকারি করে জীবিকা নির্বাহ করতো। কিন্তু তাদের মুলধন কম হওয়াতে বেশি আয় করতে পারতোনা। এসব লোকদেরকেও সাহায্য করার ব্যবস্থা করা হয়। এসব পেশাজীবি মানুষের মধ্যে লতিফের পিতা মরহুম আব্বাস আলী একজন ছিলেন। উনি খুব পরিশ্রমী ও সৎ মানুষ ছিলেন।

গ্রামে আরেকটি পেশার লোক ছিল মাটি কাটার কাজ করতো। তারা দলবেধে একজন সর্দারের নেতৃত্বে মাটি কাটার কাজ করতো। কখন নিজ গ্রামে, কখন অনেক দূরে। তাদের মাটি কাটার জন্য কোদাল, উড়া ইত্যাদি লাগতো। এদেরকেও তাদের প্রয়োজন অনুসারে সহযোগিতার হাত বাড়নো হয়। মাটি কাটার কাজ যারা করতেন তাঁর মধ্যে বিল্লাল এর আব্বা মরহুম আনছের আলী, হাসেম মামাসহ প্রায় ১০/১৫ জন মানুষ।




(গ্রামের কিছু মানুষ সুদহীন সহজ কিস্তিতে লোন নেওয়ার জন্য এসেছিলেন। ছবিটি ২০১০ সালের।)

শীতের সিজনে খেজুর গাছে অনেক রস পাওয়া যেত। এসব রস খাওয়ার পাশাপাশি জাল দিয়ে গুড় বানিয়ে ২/১ জন লোক জীবিকা নির্বাহ করতো। যেমন মনিরের আব্বা মরহুম মোছলেম আলী। তিনি এই কাজটি করতেন।

যারা গুড়ের ব্যবসা করতেন তাদের মধ্যে আমাদের শহীদুল, হায়দারের আব্বা মরহুম মোঃ মোহন মোল্লা। মোহন মোল্লা নালী বাজার থেকে খুচরা দামে গুড় কিনে পাইকারি দামে বিক্রয় করতেন।

গ্রামে ঐ সময় আখের চাষ হত। আখ বড় হলে কেটে পরিস্কার করে নালী, রুপসা এবং আরিচা বাজারে নিয়ে বিক্রি করতেন কিছু লোক। তারাও সহযোগিতা পান এখান থেকে।

আসলে গ্রামের যারা কর্মজীবি মানুষ তারা প্রায় সবাই পরামর্শ এবং সহযোগিতা নিয়ে নতুন উদ্যোমে অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের চেস্টায় লিপ্ত হয়।

এভাবে সমস্ত গ্রামের মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের সুচনা হতে থাকে।

৩। শিক্ষার উন্নয়ন **(প্রাথমিক শিক্ষা, হাই স্কুলের শিক্ষার জন্য মাসিক সাহায্য)**

দারিদ্রতা দূর করার পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি গ্রামের বালক-বালিকাদের শিক্ষার উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এদের সন্তানেরা যদি শিক্ষিত না হয় তাহলে এই অভাব চিরতরে দূর হবেনা, বিভিন্নভাবে এরা পিছিয়ে থাকবে।

গ্রামে যাদের স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়েছে, অথচ সামান্য কাগজ-কলম কিনার ভয়ে স্কুলে যাচ্ছেনা তিনি তাদের অভিভাবকের কাছে গিয়ে সরাসরি স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন বা যারা ভর্তি আছে কিন্তু নিয়মিত স্কুলে যায়না তাদেরকে স্কুলে যাওয়ার কথা বলেন। প্রাইমারি স্কুলে যারা পড়ে তাদের জন্য মাসিক ৫০ টাকা, হাই স্কুলের জন্য ১০০ টাকা বা আরো যারা আছেন বিভিন্নভাবে সবাইকে স্কুলের খরচ চালানোর ব্যবস্থা করেন।

তিনি প্রায় প্রতি বছর একবার লন্ডন থেকে ঢাকা হয়ে গ্রামে আসতেন এবং সবার খোঁজ খবর নিতেন। পড়াশুনার উন্নতি কেমন হচ্ছে, ছেলে-মেয়েরা স্কুলে নিয়মিত যায় কিনা, তাদের আরো কিছু লাগবে কিনা, কি হলে ভাল হয় ইত্যাদি খোঁজ খবর নিতেন এবং সহযোগিতার বাজেট বাড়িয়ে দিতেন।




(২০১০ সালে তোলা ছবি। পরেশ সাহার বাড়ির উপর দিয়ে হেটে যাচ্ছিলেন কাজি আব্দুল খালেক (রতন) গ্রামের মানুষের অবস্থা সরাসরি দেখার জন্য।)

বর্তমানে (২০২৪ সাল) গ্রামের বহু ছেলে ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সম্মানজনক পেশার সাথে জড়িত যারা একসময় এই সাহায্য এর সাথে জড়িত ছিল। যদি তারা প্রাইমারী বা হাই স্কুল চলাকালীন ঐ সাহায্য না পেতেন তাহলে হয়তো এতদুর আসা সম্ভব হত কিনা জানা নেই।

(কাজি আব্দুল খালেক রতন নিজে খোঁজ খবর নিয়ে যাদের স্কুলে পড়া সন্তান আছে তাদেরকে শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ ও সহযোগিতার ব্যাবস্থা করেন। নিচের এই ছবিতে কাজি আব্দুল খালেক রতন এর সাথে কথা বলছেন মোঃ আফছার আলী। পাশে আছেন জুমাত আলী মেম্বার, মরহুম শফি উদ্দিন, ইখলাছ উদ্দিন এবং কাজি আব্দুল খালেক রতন এর ভাগিনা।)




গ্রামের কিছু ছেলে আছে যারা বর্তমানে (২০২৪) এখন অনেক টাকার মালিক। চাকুরি অথবা ব্যবসার সাথে তারা জড়িত। যেমন গ্রামের কোন কোন যুবক চাকুরি পাশাপাশি মুরগীর ফার্মের মালিক।

পিতামাতার মুখ উজ্জ্বল করছে। আবার কেউ কেউ ঢাকায় ব্যবসা করে প্রতিষ্ঠিত, তারা নিজ নিজ জায়গায় সততার সাথে অবদান রাখছে। এসব প্রতিষ্ঠিত যুবকরা একসময় এসব ক্ষুদ্র শিক্ষা সহযোগিতা পেয়েছিলেন।

এই জন্য উনার নেওয়া দারিদ্রতা দূর করনে বিভিন্ন পদক্ষেপ এর মধ্যে এই শিক্ষার উন্নয়ন ছিল সবচাইতে কার্যকরী একটি পদক্ষেপ।

তৎকালীন সময়ে অর্থাৎ ১৯৯৪/৯৫ সালে প্রাইমারি স্কুলে পড়া ছাত্রদের মধ্যে গ্রামের প্রায় ২০-২৫ জন ছেলে-মেয়ে হবে যাদের সবার উনি বাড়িতে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে আর্থিকভাবে সাহায্য করার চেষ্টা শুরুর করেন। যেমন, কারো হয়তো স্কুলে বাড়ি থেকে কোনমতে খাবার খেয়ে যাওয়ার বা মুটামুটি পোশাক পড়ার মতন অবস্থা ছিল। কিন্তু খাতা-কলম, স্কুল খরচ ইত্যাদির ব্যাপারে সমস্যা ছিল। কাজি আব্দুল খালেক রতন এসব সমস্যা সমাধানের জন্য এবং যাতে নিয়মিত সবাই স্কুলে আগ্রহ নিয়ে যায় সেই জন্য কিছু টাকা প্রতি মাসে দেওয়ার ঘোষণা দেন। যেসব ছাত্ররা নিয়মিত স্কুলে যায় বা পড়াশুনার আগ্রহ আছে তিনি তাদেরকে ৫০ টাকা করে এবং যারা হাই স্কুলে পড়তো তাদেরকে ১০০ টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

এই সিস্টেম পরবর্তীতে গোহাইলবাড়ি গ্রাম পেরিয়ে দূর দূরে চলে যায়। ভার্সিটি, কলেজ পড়ুয়া ছাত্র/ ছাত্রীরাও এসব সুবিধা ভোগ করতে থাকেন। বর্তমানে (২০২৪) এসব সুবিধা আরো ব্যাপক হয়েছে। বিসিএস পরীক্ষার্থীরা সারা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে যুক্ত হয়েছে।

খাদ্য সংকটের উন্নতির পাশাপাশি শিক্ষার জন্য এই ক্ষুদ্র সহযোগিতা এত ব্যপক পরিবর্তন করবে তা হয়তো তিনি নিজেও কল্পনা করেননি।

যার ফলে ১০/১২ বছরের মধ্যে গ্রামে স্বাবলম্বী অবস্থা আসতে থাকে। কারণ ঐসব ছেলেরা প্রাইমারি এবং হাইস্কুলের পড়া শেষ করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। কেউ কেউ চাকুরি বা পেশার পাশাপাশি নিজের খরচে পড়াশুনা চালিয়ে যায়। যারা পেশা এবং পড়াশুনা উভয় চালাতে সক্ষম হয় তারা কিছুটা বিলম্বে হলেও স্বাবলম্বী হয়ে উঠে। আর যারা হাই স্কুল বা প্রাইমারি শেষ করে কর্মে যোগদান করে তারা দ্রুত অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছলতা লাভ করে।

এভাবে শিক্ষার উন্নয়ন গ্রামের দারিদ্রতা বিমোচনে বিরাট প্রভাব ফেলে।

. ৪। সুদবিহীন ঋন প্রদান **(**সুদের ভয়াবহতা সম্পর্কে মানুষদেরকে সতর্ক করে সুদহীন ঋন প্রদান**)**

গ্রামের মানুষ এনজিও যেমন গ্রামীন ব্যাংকসহ ১৯৯০/৯৫ সালে যেসব প্রতিষ্ঠান ছিল তাদের থেকে সুদ দেওয়ার শর্তে ঋন নিয়ে বিভিন্ন কাজ করতো। এসব এনজিও প্রতিষ্ঠান সহজ সরল মানুষদের ঋন নেওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে প্রলোভন দিত।

সহজে লাভ দেখাতো। প্রথম দিকে গ্রামের মানুষদের অভাব থাকা সত্বেও ঋন নিতে রাজি হতনা। কিন্তু শিক্ষিত এনজিও কর্মকর্তাদের যুক্তিপূর্ন কথায় তারা ঋন নেওয়ার জন্য রাজি হয়ে যায়।

গ্রামীন ব্যাংক এব্যাপারে সবচাইতে অগ্রগামি ছিল। পুজি বাড়লে রুজি বাড়বে অর্থাৎ বেশি টাকা বিনিয়োগ করলে বেশি লাভ হবে- এসব কথা তাদের মাথায় ঢোকান হত বাড়ি বাড়ি গিয়ে। বিশেষ করে মহিলাদেরকে তারা টার্গেট করে বুঝাতে থাকে। মহিলারা তাদের স্বামীদেরকে বুঝান শুরু করে- এভাবে কিছু মহিলা প্রথমে ঋন নেয়, এরপরে আর কিছু লোক।

চক্রাহারে সুদ বেড়ে যাওয়ার হিসাব কিতাব অশিক্ষিত এসব মানুষ বুঝতে না পেরে কিস্তি শোধ করতে করতে নিঃস্ব হতে থাকে কিন্তু কিস্তির টাকা আর শোধ হয়না।

কিস্তির টাকা শোধ না হলে মামলা বা থানা পুলিশের ভয় দেখানো হত। যারফলে বর্তমান কিস্তি শেষ হওয়ার আগেই নতুন ঋন নেওয়ার জন্য তারা পরামর্শ দিতে থাকে। নতুন লোনের টাকা দিয়ে পুর্বের কিস্তি শোধ করার চেস্টা চলতে চলতে এটাকাও শেষ হতে থাকে।

এভাবে একেকজন দিন দিন হতাশ হতে থাকে।

নগদ টাকা হাতে পেয়ে খুশিতে একদিকে যেমন শুরু হয় বেহিসাবী খরচ আবার অন্যদিকে আয়রোজগার পর্যাপ্ত না হওয়াতে খুব দ্রুত হাতের টাকা শেষ হতে থাকে। কিস্তি অর্থেক শেষ হওয়ার আগেই টাকা শেষ হওয়াতে শুরু হয় যন্ত্রনা। ঘরে নিজের স্ত্রী-সন্তানদের সাথে ঝগড়া এবং কিস্তির লোকদের প্রতি ভয়।

এনজিও এর লোকেরা কৌশলে গ্রামের লোকদেরকে দ্বারা টাকা উঠানোর জন্য চাপ দিতে থাকে। যেমন, গ্রামের যারা নতুন ঋন নিতে চাচ্ছে তাদেরকে বলে যে, ওমুক ঋন শোধ না করলে আপনাকে ঋন দেওয়া হবেনা। যারফলে এরা লোন নেওয়ার জন্য যে কিস্তি দিতে পারছেনা তাকে চাপ দিতে থাকে।

কিস্তির টাকা না দিতে পারলে তাঁর নামে মামলা হতে পারে, পুলিশ এসে ধরে নিতে পারে। এসব ভয়ে মানুষের রাতে ঘুম কম হতে থাকে। যেমন জাহাঙ্গীর ভাই লোন নিয়েছিল। উনাকে কিস্তির লোকেরা এসে ভয় দেখাতে থাকে। কিস্তির দিন উনি বাড়ি ছেরে দূরে পালিয়ে থাকে। জাহাঙ্গীর ভাই এর মাকে এসে কিস্তির লোকেরা ভয় দেখাতে থাকে।

কিস্তির টাকা শোধ করার কোন উপায় না থাকাতে অসহায় হয়ে জাহাঙ্গীর ভাই আত্বহত্যার সিদ্ধান্ত নেন এবং আত্বহত্যা করেন।




(কিস্তির টাকা শোধ করতে না পেরে আত্বহত্যা করেছিলেন এই গ্রামের জাহাঙ্গীর। কিভাবে সে আত্বহত্যা করলো সেই কথা বলছেন জাহাঙ্গীরের মা। ছবিটি ২০১০ সালে তোলা।)

ঘরের টিন, গরু-ছাগল, রিক্সা বা যার যা আছে এসব জিনিস নিয়ে এনজিওরা তাদের টাকা উসুল করতে থাকে।

কাজি আব্দুল খালেক (রতন) গ্রামে যতদিন ছিলেন এসব বিষয় অবগত হন এবং সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন।

তিনি মানুষের মধ্যে সুদের ভয়াবহতা বুঝাতে থাকেন এবং সুদের প্রতি ঘৃনা সৃষ্টি করার চেস্টা করেন। সুদের মধ্যে আসলে কোন লাভ নেই। সুদের টাকাতে বরকত হবেনা, উন্নতি হবেনা।

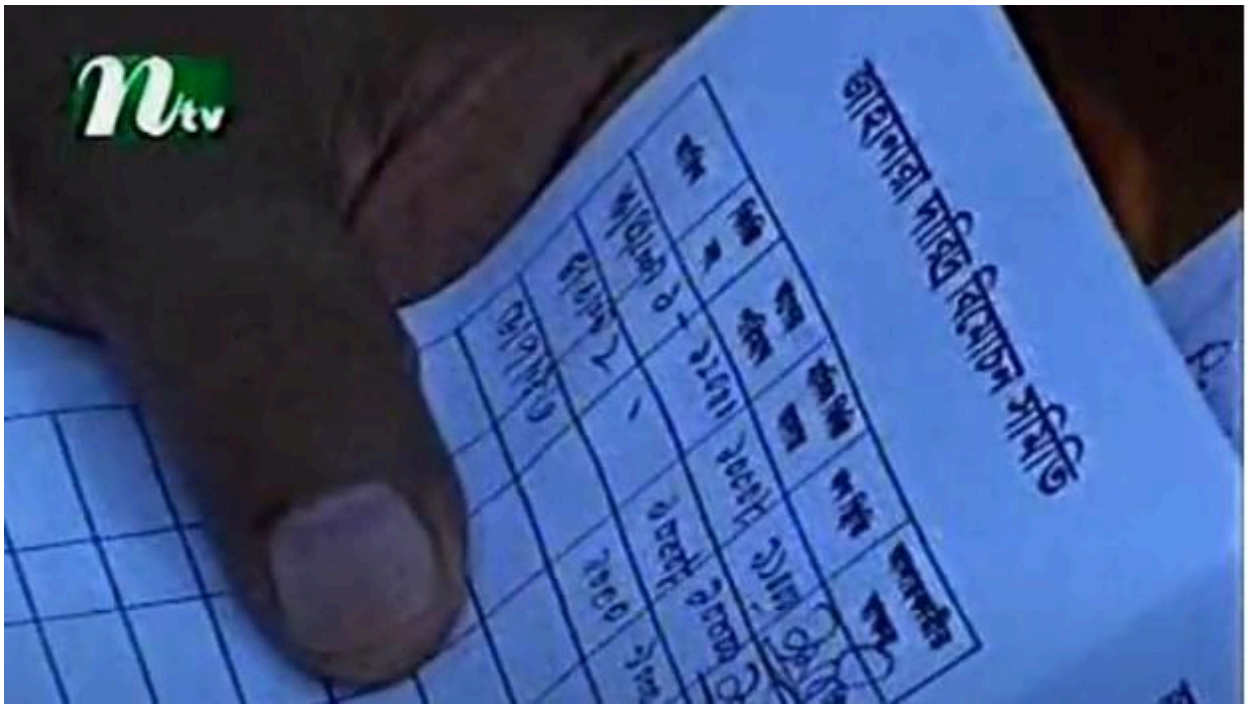
মহান আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন। সুদ দাতা, গ্রহিতা, সুদের সাক্ষী, সুদের লেখক সবাই অভিশপ্ত- এসব কথা তিনি তাদেরকে বলতে লাগলেন।

কিন্তু তাদেরকে ব্যবসা করা বা আয়ের জন্য পূজি কে দিবে?

ইনশাআল্লাহ বলে কাজি আব্দুল খালেক (রতন) সুদবিহীন ঋন দেওয়ার ঘোষণা দিলেন।

আল-হামদুলিল্লাহ এখনও এই সিস্টেম চালু আছে। তবে একটি শর্ত হল, আর কখনও এনজিও থেকে সুদে লোন নেওয়া যাবেনা।

এই ঘোষণার পরে দলে দলে লোকজন আসতে থাকে এবং শুরু হয় সহজ শর্তে সুদহীন কিস্তি দেওয়া কর্মসুচী।




(২০১০ সালের ছবি, জাহানারা দারিদ্র বিমোচন সমিতি নামে গোহাইলবাড়ি গ্রামে শুরু হয়েছিল এই যুগান্তকারী সিস্টেম। সহজ শর্তে, সুদমুক্ত লোন দেওয়ার সিস্টেম।)

এযেন এক অকল্পনীয় সিস্টেম। কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে সুদ ছাড়া কেউ কি টাকা ধার দিতে পারে। আসলে এটাই ছিল একজন আসল ধনাঢ্য মুছলমানের কাজ। ধনী মুছলমানেরা যদি এভাবে সুদহীন লোন দিত তাহলে এভাবে সুদের প্রচলন শুরু হতনা।

কিন্তু ধনী মুছলমানেরা গরীব মুছলমানদেরকে লোন সাধারণত দেয়না। গরীব মুছলমানেরা সুদ হারাম জানা সত্বেও অভাবের তাড়নায় সুদের শর্তে এসব এনজিওসহ বিভিন্ন লোক থেকে ঋন নেয়।

তাই যেসব মুছলমানদেরকে মহান আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন তাদের উচিৎ গরীব মুছলমানদেরকে সহজ শর্তে এবং সুদহীন ঋন দেওয়া।




(গ্রামের মানুষ সুদমুক্ত ঋন নেওয়ার কথা শুনে আনন্দে উপুস্থিত হন কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এর বাড়িতে। ২০১০ সালের তোলা ছবি।)

আরেকটি সমস্যা হল, ঋনের টাকা ঠিকভাবে পরিশোধ না করা। সব ধনী মুছলমানেরাই যে সুদহীন ঋন দেয়না তা ঠিক নয়। তবে যেহেতু ঋন দেওয়ার পরে সেই টাকা শোধ করার ব্যাপারে অলসতা বা গড়িমসি দেখা যায়। যিনি অনুগ্রহ করে টাকা দিলেন তার সাথে শুরু হয় মনোমালিন্য। টাকা ফেরত চাইতে গেলে একে-অপরের দোষ খুঁজা হয়। মোট কথা লোন দেওয়ার পরে টাকা চাইতে গেলে আর ফেরত দিতে চায়না, তাই আর কেউ একে-অপরেক লোন দিতে চায়না। আর এই সুযোগটাই এনজিওরা লুফে নিয়েছে। তারা সুদের শর্তে টাকা দিয়ে উসুল করার জন্য লোক নিয়োগ করে নতুন পেশা বা কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

তাই আমাদেরকে ঋন নেওয়ার পরে ঋন শোধ করার প্রবল ইচ্ছা থাকতে হবে তাহলে ধনবান মুছলমানেরা আমাদের গরীবদেরকে সুদহীন সহজ শর্তে লোন দিবে।

শুরু হল নতুন দিগন্ত। সুদ ছাড়া ঋন প্রদান কর্মসুচী।

কিন্তু এই ঋনের টাকা কিস্তির মাধ্যেম অর্থাৎ প্রতি মাসে বা প্রতি সপ্তাহে নির্দিস্ট এবং সহজ কিস্তিতে শোধ করবে কিভাবে, কার কাছে।

কাজি আব্দুল খালেক (রতন) একটি নতুন ও কার্যকরী সিস্টেম চালু করলেন। যেমন, গ্রামে বসবাসকারী একজন সৎ ব্যবসায়ীকে বেছে নিলেন। এই ব্যবসায়ীর কাছে সবাই নির্দিস্ট সময়ে কিস্তির টাকা পরিশোধ করবে। নালী বাজারের সৎ ও মুছলিম ব্যবসায়ীর মধ্যে মরহুম গোলাম শফিকে বেছে নির্ধারণ করা হল।

গোলাম শফি বর্তমানে বেঁচে নেই। উনি ২০১৪ সালে ইন্তেকাল করেছেন। যতদিন উনি বেঁচে ছিলেন এই দায়িত্ব পালন করেছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উনাকে ক্ষমা করে দিন এবং জান্নাতুল ফেরদাউস নছিব করুন-আমিন।



(মরহুম গোলাম শফি, উনি উনার দায়িত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ইন্টার ভিউ দিচ্ছিলেন ২০১৪ সালে সম্ভবত কাজি আদনান এর কাছে। কাজি আদনান (চশমা পড়া) কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এর ছেলে। উনি বাবার সাথে লন্ডন থাকেন। গ্রামে খুব কমই এসেছিলেন।)

গোলাম শফি নালী বাজারে চালের ব্যবসায়ী ছিলেন। উনার সাথে কন্টাক্ট হল যে, উনি সবার কাছে থেকে কিস্তি সংগ্রহ করবে। সবাই নির্দিস্ট সময়ে যার যার শর্ত অনুযায়ী কিস্তি দোকানে গিয়ে পরিশোধ করবে।

গোলাম শফি কেন এই দায়িত্ব পালন করবে, এই দায়িত্ব পালন করে উনার কি লাভ হবে?

যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া যদি এই দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে এই কাজ বেশি দিন করানো সম্ভব হবেনা বা অন্য কেউ লাভ ছাড়া এই কাজ করতে চাইবেনা।

গোলাম শফির সাথে চুক্তি করা হল যে, উনি সবার কাছে থেকে কিস্তির টাকা সংগ্রহ করে নিজের ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে। এতে উনি বেশি চাল কিনে ব্যবসাকে বড় করে বেশি লাভবান হতে পারবে। সারা বছর নিজ ব্যবসায় বিনিয়োগের পরে বছর শেষে কাজি আব্দুল খালেক (রতন)কে সব টাকা বুঝিয়ে দিবে। যারা ঠিকমত ঋন দিয়েছে, তাদেরকে নতুন করে আবার ঋন দেওয়া হবে এবং নতুন আরো যারা ঋন নিতে চায় তাদেরকেও শর্ত বুঝিয়ে ঋন দেওয়া হবে এভাবে যারা ঋন নিচ্ছেন তারা যেমন উপকৃত হবে একইভাবে যিনি টাকা সংগ্রহ করবেন যেমন গোলাম শফি উনিও একই টাকা থেকে উপকৃত হবেন। আল-হামদুলিল্লাহ, এভাবে একটি কার্যকরী সিস্টেম চালু হয়ে গেল। বহু মানুষের উপকারের পথ খুলে গেল।

৫। তাৎক্ষনিক সাহায্য **(প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ যেকোন দুর্ঘটনায় সাহায্য)**

১৯৯০/৯৫ সালে গ্রামে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দূর্যোগ দেখা দিত যেমন ঝড়,অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি।

ঝড় বৃষ্টিতে প্রায় সময় ঘরের চাল উড়ে চলে যেত। কখনও গাছ ভেঙ্গে ঘরের উপর পড়তো। এসব সমস্যা সমাধানে তাৎক্ষনিকভাবে কাজি আব্দুল খালেক মামার পক্ষ থেকে নগদ অর্থ দিয়ে বা টিন কিনে সাহায্য করা হত। ঘরে ঘরে নতুন টিন কেনা দেওয়ার আলোচনা পরে আসবে।

এছাড়া বন্যার সময় রাস্তা-ঘাট পানিতে ডুবে যেত। আয় রোজগারের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাক্ষনিকভাবে চাল-ডাল কিনে গ্রামের মানুষকে সাহায্য করা হত।



এছাড়া অসুখ-বিসুখ বিভিন্ন প্রয়োজনে সাহায্য করতেন কাজি আব্দুল খালেক (রতন)। ১৯৯৮ সালে বন্যার সময়, ২০২০ সালে করনার সময় লন্ডন থেকে তিনি মানুষের খোঁজ খবর নিতেন এবং মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে খাদ্য-দ্রব্য দিয়ে সাহায্য করেছেন।

বিয়ে শাদি বা বিভিন্ন প্রয়োজনে তিনি সাহায্য করেন।



২০১৪ সালে তোলা ছবি। ছবিতে মোঃ আব্দুল, পিতা মরহুম চান্দাই। উনার বড় ভাই মোস্তফা পাটুরিয়া ঘাটে গাড়ির ধাক্কায় মারা যান। পরে কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এর পক্ষ থেকে ঐ পরিবারের দায়িত্ব নেন, প্রতি মাসে ৪০ কেজি চাল, পাশাপাশি ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার খোঁজ খবর নেওয়া ইত্যাদি)।

৬। খাদ্যের ব্যবস্থা **(**গ্রামের প্রায় প্রতিটি ঘরে খাবার পৌছানো যাতে কেউ না খেয়ে না থাকে**)**

গ্রামের মানুষদের প্রথম ও প্রধান সমস্যাই ছিল খাদ্যের সমস্যা। সকালে কিছু খেলে রাতে কি খাবে এই চিন্তায় থাকতে হত অধিকাংশ মানুষের।

তিনি ১৯৯৪ সালে লন্ডন থেকে গ্রামে এসেই ঘরে ঘরে চাল কিনে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন, পাশাপাশি কিছু নগদ টাকা। চাল, ডাল, আটা, তৈল, লবন, আলু, মরিচ লোক দিয়ে কিনে বাড়ি বাড়ি যাদের ঘরে খাবারের সমস্যা পাঠানের ব্যবস্থা করতেন। এখনও (২০২৪ সাল) লন্ডন থেকে তিনি এই বিষয়টির খোঁজ খবর নেন। গ্রামের কেউ যেন না খেয়ে না থাকে তাঁর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন।

কিছু লোককে প্রাথমিকভাবে মাসিক কিছু চাল, ডালের ব্যবস্থা করে দেন। প্রতি মাসে নির্দিস্ট সময়ে ঐ নির্দিস্ট চাল-ডালের টাকা তাদেরকে দেওয়া হত। এখনও এসব ব্যবস্থা চালু আছে।




(২০১০ সালে তোলা ছবিতে প্রদর্শিত ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ ইসলাম, তাঁর ছেলে লাভলু। লাভলু জন্মান্ধ। কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এর পক্ষ থেকে মোহাম্মদ ইসমাইলকে ব্যবসার জন্য লোন দেওয়ার পাশাপাশি লাভলুর জন্যও আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়।)

## ৭। বাসস্থানের ব্যবস্থা

গোহাইলবাড়ি গ্রামে তৎকালীন সময়ে দারিদ্রতার পাশাপাশি আরেকটি বড় সমস্যা ছিল বাসস্থানের সমস্যা।

গ্রামের ৫/৭ টি বাড়ি বাদে অধিকাংশ বাড়িতেই ঘর ছিল খুব দূর্বল। বাঁশের চটা দিয়ে বেড়া, ছনের ছাউনি দিয়ে ছাঁদ ছিল অধিকাংশ বাড়িতে। এছাড়া আখ গাছের পাতা দিয়ে বেড়া বা ছাউনি দিয়েও ঘর ছিল অনেকের।




কাজি আব্দুল খালেক (রতন) নিজে গ্রামের মানুষের ঘরের অবস্থা দেখে টিন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন কোনরুপ শর্ত ছাড়াই অর্থাৎ বিনামুল্যে। ছবিটি ২০১০ সালের। টিন দেওয়ার এই প্রসেস শুরু হয়েছিল ১৯৯৪/৯৫ সাল থেকেই।

একটু জোরে ঝড় বৃষ্টি হলে ঘরের চালা দিয়ে পানি পড়তো বা ঘরের চালা উড়ে যেত। গ্রামের মানুষদের এসমস্যা সমাধানে তিনি সবাইকে নিয়ে বসে পরামর্শ করে টিন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

প্রতি বছর ১০/১৫ জনকে ২/১ বান টিন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। যার সমস্যা বেশি তাকে আগে বাকিদেরকে পরে এভাবে ধারাবাহিকভাবে সমস্ত গ্রামে টিন কিনে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। হাতে গোনা যাবে এরকম ৫/৭ টি বাড়ি বাদে প্রায় সবাই এই সহযোগিতা পেয়েছিলেন।

এরপরে ধীরে ধীরে এই চাহিদা কমতে থাকে। এখন প্রায় প্রতিটি বাড়িতে টিনের চাল ও বেড়া রয়েছে। মজবুত বাসস্থান সবাই নিজস্ব যোগ্যতায় বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তিনি এমন এক সময় টিন কিনে দিয়েছিলেন যখন টিনের ঘরে বসবাস ছিল স্বপ্নের মতন।

সবার নাম উল্লেখ করা সম্ভবনা। কারন এই প্রসেস তৎকালীন অর্থাৎ ১৯৯০/৯২ সাল বা তার আগে থেকে থেকে একটানা ২০১৪/১৫ সাল পর্যন্ত চলেছিল। এখনও প্রয়োজন সাপেক্ষে এই সাহায্য করা হয়।

সরাসরি কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এর কাছে থেকে কাগজে লিখিত পাওয়া কিছু ব্যক্তির নাম নিম্নরুপ যারা টিন পেয়েছিলেনঃ

শেখ শহীদ, শেখ জুলু, আব্দুল মোন্নাফ, হাসেম, ফরহাদ, বিল্লাল, খালেক, জ্যোৎস্না, দুলাল, আইনদ্দীন, আফছার, রাশেদা, ইকলাছ, কাদের ভুইয়া, জাহাঙ্গীর, বাচ্চু, মাইনদ্দিন, ছকেল মোল্লা, জুলুমদ্দিন, সেলিম মোল্লা, তাহের, সেইমদ্দিন, ছকিনা, রহম আলী, আজিজ, খুকি, নয়াতন, বিনাত, আলিম, মনো, ঘটু, আফছার ব্যাপারী, নাজমদ্দিন, শামজদ্দিন, আব্দুল বারেক, জুমাত মোল্লা, আজিমন, তারার মা, রাশেদা, চান্দাই শেখ, আক্কাছ আলী, শেখ বিনাত, আফছারের মা, ইউনুস আলী, শেখ জামান, ইসলাম, রিজিয়া, চান মোল্লা, ফনি মিস্ত্রি, আব্দুল বারেক, লেবুর মা, আক্তার, হারেজ, মোহন মোল্লা, নোওশেরের মা, আনছের আলী, মোসলেম, মোনছের আলী, ছামছের আলী, হাবু, হারুন, আনোয়ারা, ছালেহা,রিপন, স্বপন, বিল্লালের মা, বিনাত শেখ, শেখ আদম, তোফছের আলী, রাজ্জাক শেখ, আইনদ্দীন, বিনাত মোল্লা, মালেকা।



(গোহাইলবাড়ি গ্রামে ঐ সময় (১৯৯০/৯২) এধরনের ঘরই বেশি ছিল।)

কোন কোন লোককে একাধিকবার টিন দেওয়া হয়েছিল। কেউ কেউ টিনের টাকা দিয়ে ঘর না তুলে খেয়ে ফেলেছিল অভাবের তাড়নায়। অনেকেই আবার নিজেই চালের টিন খুলে বিক্রি করে ফেলেছিল।

টিনের ঘরে বাস করা ছিল গ্রামবাসীর একটি স্বপ্ন যা তিনি পুরণ করে দিয়েছিলেন।

## ৮। মাসিক বা নিয়মিত সাহায্য

গোহাইলবাড়ি গ্রামে অল্প কিছু মানুষ ছিল যাদের আয় রোজগারের কোন ব্যবস্থা ছিলনা বা আয় করার মতন সামর্থ্যও ছিলনা। তাদের জন্য নিয়মিত একটি আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

যেমন প্রতি মাসে হয়তো ১৫/২০ কেজি চাউল অথবা অন্য কিছু। প্রতি মাসে নির্দিস্ট সময়ে মরহুম গোলাম শফির কাছে থেকে এই সহযোগিতা নিয়ে আসতে হত।

যাদের হয়তো অনেক বয়স হয়ে গেছে, খেটে খাওয়ার সামর্থ্য নেই বা কোন ছেলে সন্তান নেই তাদের জন্য এই ব্যবস্থা ছিল।

বর্তমানেও কিছু মানুষের জন্য এই সাহায্য চালু আছে। যেমন কয়েক বছর আগে গ্রামের মোস্তফা ভাই এর ইন্তেকালের পরে তাঁর পরিবারের জন্য এই চাল মাসিকভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

মোস্তফা ভাই এর ২ মেয়ে ও ১ ছেলের পড়াশুনা বাবদ খরচ দেওয়ার দায়িত্ব নেন।




(গোহাইলবাড়ি গ্রামের তৎকালীন সময়ের কিছু মানুষ। ছবিটি ২০১০ সালে তোলা। কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এর বাড়িতে এসেছিলেন সাহায্যের জন্য।)

<u>৯। স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থাঃ</u>

(গোহাইলবাড়ি জাহানারা ফ্রাইডে ফ্রি ক্লিনিক, প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৯২)

কাজি আব্দুল খালেক (রতন) শুধু দারিদ্রতা থেকে মুক্তি নয় বরং সুস্বাস্থ্য যাতে নিশ্চিত হয় সবার জন্য সেই জন্য তিনি নিজের বাড়িতে বিনামুল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তৎকালীন সময়ে মানুষের মধ্যে চিকিৎসার ব্যাপারে বহু কুসংস্কার বিরাজমান ছিল। গ্রামের মানুষ সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত ছিল।




(আল-হামদুলিল্লাহ, নিয়মিত এখনও এই ক্লিনিক থেকে মানুষ উপকৃত হচ্ছে।)

মানিকগঞ্জ শহরে অথবা শিবালয় থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ছাড়া পেশাজীবি ও শিক্ষিত ডাক্তারদের সহযোগিতা পাওয়া যেতনা। যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন ভাল ছিলনা। গ্রাম থেকে মানিকগঞ্জ শহরে সাধারণত কেউ বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া যেতনা। উথুলী বা টেপড়ায় যে সরকারি হাসপাতাল আছে সেখানে যাতায়াতও নিয়মিত ছিল না কারোর জন্যই। কারন গ্রাম থেকে ঐ সময় উথুলী যেতে প্রায় ১ বা দের ঘন্টা সময় লাগতো। নালী বাজার থেকে নৌকা বা লঞ্চে উথুলী যাওয়া লাগতো। অধিকাংশ মানুষ পায়ে হেটে যাতায়াত করতো। লঞ্চে যেতেও অনেক সময় লাগতো। তাছাড়া হাতে নগদ টাকা খুব কম মানুষেরই ছিল যা দ্বারা সরকারি হাসপাতাল থেকে সেবা নেওয়ার মত। নিয়ম কানুন না জানা ছিল আরেক সমস্যা অর্থাৎ সরকারি হাসপাতালে গেলে কি করতে হবে, কিভাবে সেবা নিতে হবে এসব চিন্তা করে কেউ আর সেখানে যেতে চাইতোনা। বেশির ভাগ মানুষ জানতোই না যে সরকারি হাসপাতালে বিনামুল্যে চিকিৎসা পাওয়া যায় বা চিকিৎসা নেওয়ার এধরনের ব্যবস্থা আছে।

ঝাড়-ফোক, পানি-পড়া, তেল পড়া, গাছের শিকর বাকর, লতা-পাতা খাওয়াসহ কিছু অন্ধ বিশ্বাস এর মাধ্যমে অধিকাংশ লোক চিকিৎসা করাতো।

ডায়রিয়া, জ্বর, মাথা ব্যথা, পেটে ব্যাথা, শরীর ব্যথা, ছেংগা লাগা, হাঁপানি, শ্বাসকস্ট, যক্ষা, বসন্ত, গুটি বসন্ত, চুলকানি, খোশ-পচড়া, কষা,জন্ডিস, আমাশয়, ম্যালিরিয়া, পাইলস ইত্যাদি ছিল খুব কমন রোগ।

এসব রোগের চিকিৎসার জন্য কেউ কেউ নালী বা রূপসা বাজারে হাতুড়ে ডাক্তারদের কাছে যেত। তাদের চিকিৎসার দ্বারা মানুষের অনেক উপকার হত। তারা যেসব মেডিসিন দিত সেগুলোর দ্বারা অনেক রোগ সেরে যেত। কিন্তু রোগের মাত্রা বেড়ে গেলে মেডিসিন কাজ না করলে তারা সরকারি হাসপাতালে বা শহরে যাওয়ার পরামর্শ দিত।

কিছু লোক এমন ছিল তারা রোগ হলে কবিরাজদের কাছে যেত। কিছু পীর বা মারফতি পাগল ছিল গ্রামে তাদের কাছে দোয়া বা চিকিৎসার জন্য সাহায্য চাইতো। এসব অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারাও কিছু রোগ সাময়িকভাবে সেরে যেতে। কিন্তু সঠিক চিকিৎসা হতনা। চিকিৎসার অভাবে সব সময় অসুস্থতা নিয়েই কাজ কর্ম করতে হত। কেউ কেউ চিকিৎসার আশা ছেড়েই দিত।

এসব সমস্যা সমাধানের চিন্তায় কাজি আব্দুল খালেক (রতন) মানিকগঞ্জ শহর থেকে এমবিবিএস ডাক্তার এনে গ্রামের মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে চাইলেন।



এই বাড়িতে এখনও ক্লিনিক চলছে।

তার প্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালে মানিকগঞ্জ শহর থেকে প্রতি শুক্রবার এমবিবিএস ডাক্তার আসা শুরু হল। ফ্রিতে মানুষের জন্য সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা হল। এই ক্লিনিকের নাম দেওয়া হল কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এর মায়ের নামানুসারে অর্থাৎ “জাহানারা ফ্রাইডে ফ্রি ক্লিনিক”।



(এই বিল্ডিংকে হাসপাতালের কাজে ব্যবহার করা হয়। একরুমে ডাক্তার বসেন, অন্য রুমে টেস্ট এর ব্যবস্থা। বিনামুল্যে রোগীদেরকে অভিজ্ঞ এবং উচ্চ শিক্ষিত ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা দেওয়া হয়।)

আল-হামদুলিল্লাহ, এই ক্লিনিক এখন আরো উন্নত হয়েছে, এখনও বহাল আছে। বর্তমানে ব্লাড, ইউরিন, ইত্যাদির পরিক্ষা পর্যন্ত করে বিনামুল্যে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

এই ক্লিনিকে ডাক্তার যেদিন আসতেন সেই দিন রোগীদের সিরিয়াল মেইন্টেনের জন্য গ্রামের ঐসব স্কুল পড়ুয়া ছেলেরা থাকতো যাদেরকে মাসিক পড়াশুনার খরচ দেওয়া হত। এসব ছাত্ররা স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে দায়িত্ব পালন করতো, এতে এসব ছাত্রদের যোগ্যতা বৃদ্ধি পেত। অন্যদিকে রোগীরা নিয়ম মাফিক চিকিৎসা সেবা পেত।

গ্রামের কিছু মানুষ বিশেষ করে মহিলারা ক্লিনিকে ডাক্তার বা প্যাথলজি অপারেটরদের সহযোগি হিসাবে কাজ করতো তাদেকেও মাসিক কিছু বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। যারা ক্লিনিক পরিস্কার করতো তাদেরকেও বেতন দেওয়া হত। এভাবে রোগীদের সেবার পাশাপাশি ছাত্রদের কর্মদক্ষতা অর্জন এবং কিছু লোকের কাজের ব্যবস্থা হয়েছিল এই ক্লিনিকের মাধ্যমে।

ক্লিনিকের সুনাম ছড়িয়ে পরে গোহাইলবাড়ি গ্রাম থেকে আশে পাশের গ্রামগুলোতে। যেমন নালী, গোয়ালখালি, ধুতরাবাড়ি, দড়ি কয়রা, রুপসাসহ অনেক গ্রামে। দূর থেকে চিকিৎসা সেবা নেওয়ার জন্য এই ক্লিনিকে এখনও মানুষ আসে।

গ্রামের মানুষের পেশাগত উন্নতি, বাসস্থানের ব্যবস্থা, শিক্ষার উন্নতির পাশাপাশি এই ক্লিনিক যেন আরেক বিরাট শক্তি। ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতে উন্নতি হতে থাকে যারফলে গ্রামের মানুষ দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠে। আর সুস্থ মানুষ কর্মক্ষেত্রে আরো ভুমিকা পালন করে নিজের আয় রোজগার বাড়ানোর মাধ্যেম। অন্যদিকে তাদের সন্তানেরা স্কুলে যেতে পারছে, পড়াশুনা করছে, সন্তানদের উন্নতি দেখে স্বপ্ন দেখতে থাকে গ্রামের মানুষ সুন্দর আগামীর।

ইসলামী আকিদা প্রতিষ্ঠায় কাজি আব্দুল খালেক **(রতন)** এর চেস্টা

## ১। নামাজ প্রতিষ্ঠার চেস্টা

কাজি আব্দুল খালেক (রতন) যখন দেখতে পারছিলেন গ্রামের মানুষের পরিবর্তন শুরু হয়েছে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন দিকে উন্নতি হচ্ছে। তখন তিনি একজন মুছলমান হিসাবে গ্রামের মানুষের নামাজের দায়িত্বও গ্রহন করেন।

কারন মহান আল্লাহর কাছে সকল কাজের জবাবদিহী করতে হবে। দারিদ্রতা দূরীকরনের পাশাপাশি খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার যেমন ব্যবস্থা করতে হবে ঠিক তেমনি একজন মুছলমানের ঈমান আকিদারও খোঁজ খবর নিতে হবে।

গ্রামের মানুষের মধ্যে আরেকটি সমস্যা ছিল মুছলমান হওয়া সত্বেও নামাজে অবহেলা করা। নামাজ, পর্দা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারনা পোষণ করা। গ্রামে ৪/৫ টি পরিবার বাদে প্রায় সবাই ছিল বেনামাজি অর্থাৎ নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতোনা। ঈদের নামাজ ছাড়া অন্য কোন নামাজ আদায় তেমন কেউ করতোনা। সয়দাবাদ মসজিদে গিয়ে ঈদের নামাজ আদায় করতো প্রায় সবাই। কিন্তু সারা বছর ৫ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ বা জুমার দিন জুমার নামাজ তেমন কেউ পড়তোনা।

জুমার নামাজ হাতে গোনা যাবে এরকম কিছু মানুষ নালী বাজারে বা সয়দাবাদ মসজিদে গিয়ে আদায় করতো। যেমন জসিমের নানা মরহুম আক্তার মোল্লা, মোঃ আব্দুস ছালাম মাস্টারের পিতা মরহুম আব্দুস ছাত্তার মোল্লা, কাজি রফিকুল ইসলাম  এর পিতা কাজি আশরাফ হোসেন সাহেব, মেহেদী ভাই এর পিতা জুমাত আলীসহ কিছু মানুষ নালী বাজারে গিয়ে জুমার নামাজ আদায় করতেন বলে আমরা দেখেছি।

গ্রামের অন্যসব মানুষ যারা ঈদের নামাজ ছাড়া অন্যান্য নামাজ আদায় করেননা তাদের কি হবে?

তাছাড়া তিনি যখন তাদেরকে নামাজ পড়তে বলতেন তখন তাড়া নামাজের পরিবেশ নেই, মসজিদ অনেক দূরে এসব অজুহাত দাড় করাতেন।

এসব ভেবে অবশেষে নিজের বাড়ির যে বিল্ডিং এ হাসপাতাল ছিল সেই বিল্ডিং এর মাঝে একটি বড় খালি রুম ছিল। ঐ রুমে নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বেশকিছু জায়নামাজ ক্রয় করে দেওয়া হয়েছিল যাতে সবাই আনন্দের সাথে নামাজ আদায় করেন। প্রথম এই ওয়াক্তিয়া নামাজের ঘরে ইমাম হিসাবে দড়ি কয়রা গ্রামের ফাইজদ্দিন মোল্লাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি সবার ইমাম হিসাবে নামাজ আদায় করেন।

যদিও এই নামাজের ব্যবস্থা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। কয়েকদিন নামাজ আদায়ের পরে আর মুছুল্লী খুজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এর এই উদ্যোগ প্রশংসনীয় ছিল। তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি যেমন খাবারের যোগানের চেস্টা করেছেন একইভাবে মুছলমান হিসাব নামাজ প্রতিষ্ঠার চেস্টা করেছেন।

গ্রামের বাচ্চাদের জন্য এই নামাজ ঘরেই মক্তবের ব্যবস্থা হয়। যারা এখানে আল-কুরআন ও নামাজ শিক্ষার জন্য আসতেন তাদের জন্য হালকা খাবারের আয়োজন করা হয় যাতে সবাই আগ্রহ নিয়ে এখানে পড়তে আসে। এই পড়াশুনার ব্যবস্থা এখনও চালু আছে।

## ২। মসজিদে সাহায্য প্রদানঃ

কাজি আব্দুল খালেক (রতন) ছিলেন মনে প্রানে একজন খাটি মুছলমান। মুছলমানদের কোন কস্ট বা অসুবিধাতে তিনি স্থির থাকতে পারতেননা।

সয়দাবাদ মসজিদে ঐ সময় নানান সমস্যা ছিল বিশেষ করে আর্থিক সমস্যা। ইমাম সাহেব এর মাসিক হাদিয়া নিয়মিত দিত পারছিলেননা মসজিদ কমিটি। কমিটির লোকদের মধ্যে সম্ভবত তৎকালীন মসজিদ কমিটির সভাপতি আব্দুর রশিদ (চুন্নু মিয়া) এর ছেলে এম এ রহমান (দুলাল) সাহেব অনুরোধ করলে ঐ মসজিদের ইমাম সাহেব এর জন্য মাসিক হাদিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এরপরে থেকে নিয়মিত এই হাদিয়া চালু আছে এখনও।

প্রতি বছর মাহে রমজানে কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এর পক্ষ থেকে মসজিদে ইফতার দেওয়ার চেস্টা করা হয়।



(আল-হামদুলিল্লাহ, গোহাইলবাড়ি জিরাতুননেছা জামে মসজিদে মাহে রমজানে ইফতারের আগের মুহুর্তের ছবি। ২০২২ সালে তোলা এই ছবি।)

## ৩। আল-কুরআনসহ বিভিন্ন ইসলামিক বই হাদিয়া দেওয়াঃ

আল-কুরআন যাতে গ্রামের প্রতিটি মানুষ পড়ে এবং বুঝে বুঝে পড়ে সেইজন্য তিনি বাংলা অনুবাদ এবং সংক্ষিপ্ত তাফসীরসহ আল-কুরআনের কপি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। যারা আগ্রহী তাদেরকেই তিনি হাদিয়া হিসাবে দিতে থাকেন। প্রায় প্রতিটি বছর রমাজান মাসে এই হাদিয়া দেওয়া হয় তবে যেকেউ আগ্রহী হলেই তাকে যেকোন সময়ে তিনি এই হাদিয়া দিয়ে থাকেন।

এছাড়া মক্তবে পড়তে থাকা বাচ্চাদের যারা সহিহভাবে আল-কুরআন পড়তে শিখে তাদেরকে নিয়মিত এই হাদিয়া দেওয়া হয়।




(কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এর দেওয়া আল-কুরআন তুলে দিচ্ছেন গ্রামবাসীর মধ্যে কিছু মুছুল্লী। ছবিটি গোহাইলবাড়ি জিরাতুননেছা জামে মসজিদে জুমার দিনে তোলা, ২০২২ সালে।)

৪। শির্ক, বিদআত, কুসংস্কার, ভন্ড পীর, গান-বাজনা, কবর পুজাসহ অন্যান্য ইসলাম বিরোধী কাজের বিরুদ্ধে অবস্থানঃ

কাজি আব্দুল খালেক (রতন) কখনও কোন শির্কি কাজকে সাপোর্ট করেননি। শির্কি কাজে সহযোগিতা বা তাদের সাথে একমত বা তাদেরকে পছন্দ করা – কোনটাতেই তিনি কখন ছিলেননা।

শির্ক হল মহান আল্লাহর সাথে কাউকে শক্তিতে, ইবাদতে অংশীদার মনে করা যা একটি জঘন্যতম অপরাধ। মহান আল্লাহ ব্যতিত একজন মুছলমান অন্য কারো কাছে সাহায্য চাইতে পারেনা। মহান আল্লাহর শক্তির সাথে অন্য কারো শরীক নেই,

তিনি একাই সবকিছু করেন। তিনি ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করা বা সাহায্য চাওয়া বা ইবাদত করা যাবেনা। যদি কেউ মহান আল্লাহ ব্যতিত কারো সামনে মাথা নত করে বা সাহায্য চায় তাহলে সে মহান আল্লাহর সাথে শির্ক করার মত অপরাধ করলো যা কখন তিনি মাফ করবেননা।

গ্রামের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোক সরাসরি শির্কি কাজ করতো। কিছু লোক না বুঝে এসব কাজে অংশগ্রহন করতো। আবার কেউ সুবিধার আশায় এসব কাজে সহযোগিতা করতো বা এখনও করে।

কাজি আব্দুল খালেক (রতন) যখন জানতে পারতেন যে ওমুক ব্যক্তি শির্কি কাজ করে অন্যদের ঈমান নষ্ট করার চেস্টা করছে তিনি তাকে সরাসরি সতর্ক করতেন এবং তার সাথে কথাবার্তা ও সহযোগিতা বন্ধ করে দিতেন। সাধারণ মুছলমানকে এদের থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিতেন।

শির্কের পাশাপাশি কিছু বিদআত আগেও প্রচলিত ছিল এবং এখনও প্রচলিত আছে। বিদআত সম্পর্কেও তিনি সুযোগ পেলে সাধ্যমত সবাইকে সচেতন করার চেস্টা করতেন।

কুসংস্কার প্রচুর ছিল গ্রামে, এখনও আছে। যেহেতু গ্রামের মধ্যে কিছু হিন্দু লোকের বসবাস রয়েছে। এসব হিন্দু লোকদের দেখাদেখি বিয়ে শাদিতে, মুছলমানদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যুগ যুগ ধরে কিছু কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। যেমন, গ্রামে প্রতি বছর শীতের সময় গাসসি নামে একটি অনুষ্ঠান পালন করা হয়। হিন্দুদের মতন মুছলমানেরাও এসব কাজ নিয়মিত করা শুরু করেছে। পাটখরি দিয়ে বিড়ি বানিয়ে মুখ দিয়ে টানলে শীতে তার মুখের ঠোট আর ফাটবেনা মনে করতেন সবাই। এছাড়া গভীর রাতে বাড়ির উঠানে গড়াগড়ি করতো সুস্থতার আশায়।

কোন কোন মহিলার উপর জিন-ভুত আছর করতো। তখন ঐ মহিলা অস্বাভাবিকভাবে অংগভঙ্গী করে সবার কথা শুনতো এবং বহু সমস্যার সমাধান করে দিত। যেমন গ্রামের হিলার বউ প্রায়ই এসব কাজ করতো। যখন তার উপরে জিন ভুতের আছর হত গ্রামের মানুষ রোগ নিরাময় ও বহু সমস্যা সমাধানের আশায় তার কাছে যেত। সে যখন ধ্যান অবস্থায় থাকতো তখন সবাই বিভিন্ন সমস্যা তাকে বলতো এবং সমাধান জানতে চাইতো। তখন ঐ মহিলা ধ্যানঅবস্থায় যা বলতো সবাই সেটাকে বিশ্বাস করতো।

রবিবার ও মঙ্গলবার বাশ ঝাড় থেকে বাশ কাটা যাবেনা এতে অমঙ্গল হবে- হিন্দুদের এই ধারনা মুছলমানদের মধ্যেও মাঝে মাঝে দেখা যেত।

প্রতি বছর গরমের দিনে বা চৌত্র মাসে বৃষ্টির আশায় সাত দিন রাতে দলবেধে সারা গ্রাম প্রদিক্ষন করা হত ইসলামিক কিছু কথা সুরে সুরে ফার্সি ভাষায় বলার মাধ্যমে। শেষের দিন সম্মিলিত দোয়ার পাশাপাশি মিলাদের আয়োজন হত এবং সবার জন্য বড় আকারে খাবার বা খীরের ব্যবস্থা করা হত- বৃষ্টি ও গ্রামকে সুরক্ষিত রাখার আশায়। এসব কাজ এখনও আছে কিন্তু কাজি আব্দুল খালেক (রতন) কখনও এসব কাজকে সঠিক মনে করেননি।

তিনি তাঁর সামনে কখনও এসব কাজ হতে দেখলে বাধা দিতেন এবং সঠিক কাজটি বুঝানোর চেস্টা করতেন। এধরনের বহু কুসংস্কার কাজ গ্রামে বিদ্যমান ছিল, এখনও আছে। তবে শিক্ষার উন্নতির ফলে গ্রামের যুবকদের কারনে এসব কাজ কমতে শুরু করেছে।

গোহাইলবাড়ি গ্রামের মানুষ ছিল প্রচুর সহজ ও সরল এবং অতিথিপরায়ন।

এই সরলতার ও অতিথিপরায়নতার সুযোগে গ্রামে কিছু ভন্ডপীরের আগমন হয়েছিল। এসব পীরেরা চমকদার কিছু গল্প বা কাহিনী বলে মানুষের মন আকর্সন করতো। গ্রামের কিছু মানুষকে মুরিদ বানিয়ে নিয়মিত আসা যাওয়া করতো। যেহেতু গ্রামের অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত ছিল। অল্প কিছু মানুষ ছাড়া অধিকাংশ লোকের ধর্মীয় জ্ঞান ছিলনা বললেই চলে।

এই সুযোগে আবেগপ্রবন কিছু কিচ্ছা কাহিনী বলে গভীর রাত পর্যন্ত আসর জমিয়ে রাখতো। এসব আসরে বেশির ভাগ ছিল মহিলা। এসব ভন্ড পীরদের টার্গেট ছিল মহিলা মুরিদ।

গল্প, কিচ্ছা, কাহিনীর পাশাপাশি গান-বাজনার ব্যবস্থা করা হত। কখনও ঢোল বাদ্য বাজিয়ে বিভিন্ন ধরনের গান পরিবেশন করা হত।

বিড়ি সিগারেট, চা চলতো গানের আসরে। সবশেষে খিচুরী খাওয়ান হত।

গ্রামের ২/৩ টি বাড়িতে এসব কাজ চলতো, এছাড়া গ্রামের অন্য সব মানুষ দর্শক হিসাবে উপুস্থিত থাকতো।

ভন্ডপীর এজন্য বলা হচ্ছে, এসব পীরেরা নিজেদেরকে মারফতের পীর দাবী করতো। মুরীদসহ সাধারন মানুষের থেকে সিজদা নিত, ভক্তি নিত। নামাজ, রোজা, পর্দাকে তারা জরুরী মনে করতনা বরং যারা নামাজ পরে, পর্দা করে তাদেরকে নিয়ে হাসি তামাশা করতো।

এসব পীরেরা নিজেদেরকে মুর্শিদ দাবি করতো। কখনও এমন হত পীর তার মহিলা মুরিদকে নিয়ে ভেগে গিয়ে বিয়ে করে ফেলতো। গ্রামে তখন অবশ্য কবরে সিজদা দেওয়ার মতন কাজ হতনা, কিন্তু পরবর্তিতে কবরে সিজদা দেওয়ার মতন শির্কি কাজ শুরু হয়েছে। তবে গ্রামের অল্পকিছু লোক ছাড়া কেউ এই কবরে সিজদা বা ভক্তি দেওয়াকে সমর্থন করেনা, তবে প্রকাশ্যে প্রতিবাদও করেনা।

কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এসব কাজকে কখন সঠিক মনে করতেননা বরং এসব কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন। নিজের সাধ্যমত প্রতিবাদ করতেন, বুঝাতেন। না বুঝলে সহযোগিতা বন্ধ করে দিতেন তবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে এরুপ কাজ করতেননা।

পাশাপাশি সবাইকে আল-কুরআন, সুন্নাহ ও নামাজ, পর্দাসহ মহান আল্লাহর হুকুম সকল হুকুম আহকাম মানার জন্য উৎসাহ দিতেন।

## ৫। সবসময় গ্রামের খোঁজ খবর নেওয়াঃ

গ্রামের প্রায় প্রতিটি ভাল মানুষের সাথে সরাসরি যোগাযোগ আছে কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এর। উনার সুন্দর একটি অভ্যাস হল সবার সাথে ধৈর্যসহকারে কথা বলা।

গ্রামের ছোট-বড়, ধনী-গরীব সবার সাথে উনি সময় নিয়ে কথা বলেন। সম্মান দিয়ে কথা শুনেন, বিনয়ের সাথে কথার উত্তর দেন। যেন এটা উনার দায়িত্ব সবার সমস্যাকে শুনা এবং সমাধান করা।

কাউকে উনি কিছু দিতে চাইলে ভাল করে তার খোঁজ খবর নিয়ে তারপরে দান করার ব্যবস্থা করেন। উনি চান সঠিক ব্যক্তিই যেন উনার সাহায্য পান। যার জন্য সবার সাথে যোগাযোগ রাখেন।

গ্রামে উনার কিছু বিশ্বস্ত ও সৎ ব্যক্তি রয়েছে যারা এসব দান করার কাজে উনাকে সাহায্য করেন। তারা খুব দ্রুত সঠিক ব্যক্তিকে খুজে বের করে তাদের হাতে দানের বস্তু বা নগদ টাকা পৌছে দেন।

যারফলে দান পাওয়ার বা সহযোগিতা পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিকে কোন টেনশন করতে হয়না। সে নিজে কিছু বুঝে উঠার আগেই তার বাড়িতে গোপনে তার প্রাপ্য বস্তু চলে যায়।




(২০১০ সালের ছবি, কথা বলছিলেন গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনদের সাথে।)

## ৬। মুছলমানদের অগ্রাধিকার দেওয়াঃ

গ্রামের প্রায় ১০/১২ টি পরিবার বাদে সবাই মুছলমান। তিনি তার সাহায্যের জন্য মুছলমানদেরকেই প্রাধান্য দিতেন।

মুছলমানদের পর্যাপ্ত সহযোগিতার পরে যদি কেউ ২/১ জন হিন্দু থাকে এবং তারা কিছু দেওয়ার মতন যুক্তি সঙ্গত কারন থাকে তাহলে কিছু দিতেন অন্যথায় সবকিছু মুছলমানদের জন্য বরাদ্দ ছিল।

হিন্দুদের মধ্যে অনেককেই সাহায্য করেছেন। তবে সব তথ্য আমাদের কাছে নেই। কিন্তু ফনিন্দ্র সুত্রধরকে ঘর তোলার জন্য টিন দিয়েছিলেন যার প্রমান আমাদের কাছে রয়েছে। ফনিন্দ্র সুত্রধরের ছেলে গৌরাঙ্গ সুত্রধর বর্তমানে ঢাকায় চাকুরে করে, ভাল অবস্থায় আছে।

আসলে তৎকালীন সময়ে মুছলমানদের অবস্থা সব চাইতে খারাপ ছিল, সচেতনার অভাব ছিল, শিক্ষার অভাব ছিল। মুছলমানদের পিছিয়ে থাকা, আর্থিক দুরাবস্থার পরিবর্তন করাকে নিজের ঈমানী দায়িত্ব মনে করতেন।

৭। কুরবানীর ঈদে নিয়মিত গরু কুরবানী করা, রমাজানসহ বিভিন্ন সময় নিয়মিত সাহায্যঃ

আমাদের জানামতে ১৯৯২/৯৩ সাল থেকেই গ্রামের মানুষদের জন্য গরু কুরবানী শুরু হয়েছে। নিয়মিত এই গরু কুরবানী এখনও চালু আছে। প্রতি বছর কুরবানীর ঈদে প্রতিটি মুছলমানের ঘরে গরুর গোস্ত পৌছে দেওয়া হয় সুন্দরভাবে।

প্রায় ৩০ বছর যাবত এই সিস্টেম চলছে। একসময় মরহুম গোলাম শফি এই দায়িত্ব পালন করতেন। এরপরে বর্তমান জুমাত আলী এই দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এই কাজে সহযোগিতা করতেন ইখলাছ মামাসহ গ্রামের অনেকে।

গরু কিনে বন্টন করার প্রতিটি বিষয়ে সরাসরি লন্ডন থেকে পরামর্শ দেন কাজি আব্দুল খালেক (রতন)।

গ্রামের মানুষ একসময় কুরবানীর ঈদে একটু গোস্ত পাওয়ার জন্য সিরিয়াল ধরে রোদ্রের মধ্যে বিভিন্ন ধনী লোকের বাড়িতে বসে থাকতো। গোস্ত পাওয়ার আশায় দুপুর গড়িয়ে বিকাল বা কখনও রাত হয়ে যেত। এরপরেও আশংকায় থাকতে হত গোস্ত পাবে কি পাবেনা। অর্থাৎ না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো।

কিন্ত যখন থেকে কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এই উদ্যোগ নিলেন তখন থেকে নিয়মিত কুরবানীর গরুর গোস্ত খাওয়া শুরু হয়ে গেল গ্রামের মানুষের। কেউ যদি গোস্ত বিলি করার সময় উপুস্থিত না থাকতে পারে তাহলে গোস্ত পৌছে দেওয়া হত তাদের বাড়িতে। উনারা নিজেরা সমস্ত মানুষদের মধ্যে বন্টন করে দিতে বলতেন, নিজেদের জন্য কিছু রাখতেননা। কারন উনারা কেউ গ্রামে থাকেননা।

কুরবানীর ঈদের দিন গ্রামের কিছু কর্মঠ পুরুষ মানুষ সকাল থেকেই গরু জবাই ও বন্টনের কাজে নিজ উদ্যোগে উপুস্থিত হয়। সকালে গরু জবেহ করার পরে সেই গোস্ত কেটে টুকরা টুকরা করে পালা পাথর দিয়ে মেপে পলিথিনের ব্যাগে প্যাকেট করা হয়।

পুর্ব থেকেই গ্রামের প্রতিটি ঘরে যাতে গোস্ত সুন্দর ও ইনসাফ সহকারে পৌছায় সে জন্য তালিকা করা হয়। স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান মিলে একটি পরিবার-এভাবে গোস্ত বন্টন করা হয়, কারো যদি পরিবারে লোক বেশি থাকে তখন তাকে ইনসাফ করে গোস্তের পরিমান বাড়ানও হয়ে থাকে।



(গোহাইলবাড়ি গ্রামে ঈদের দিন। গোহাইলবাড়ি জিরাতুননেছা জামে মসজিদে গ্রামবাসী ঈদের নামাজ আদায় করেন। ছবিটি ২০২১ সালের।)

ঈদ-উল ফিতরে ভিন্ন চিত্র। ঈদ-উল ফিতরে অর্থাৎ রমজান মাসে গ্রামের মানুষের মধ্যে যারা গরীব তাদের জন্য ইফতার কিনে বাড়ি বাড়ি পাঠান হত। কার বেশি সমস্যা থাকলে চাল-ডাল কিনে দেওয়া হত। ঈদের দিন যাতে সুন্দরভাবে ঈদ উদযাপন করতে পারে সেইরকম কিছু গরীব পরিবারকে ঈদের সদাই সহ আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা হত।

এছাড়া গ্রামের মসজিদে নিয়মিত ইফতারি ব্যবস্থা করা হচ্ছে গত কয়েক বছর যাবত। সবাই যাতে মসিজদে এসে ইফতারি করতে পারে সেই জন্য মসজিদের দায়িত্বশীলদের সাথে পরামর্শ করে এই ইফতারি দেওয়া হচ্ছে, কখনও ২৭ রমজানে সেহরিরও আয়োজন করা হয়।

আমাদের দেখা ১৯৯০/১৯৯৫ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত গোহাইলবাড়ি গ্রামের চিত্র

## ১। গ্রামের প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক অবস্থাঃ

নালী বাজার থেকে একটি রাস্তা উত্তর দিকে সোজা চলে গেছে। এই রাস্তার পশ্চিম পাশে ইছামতি নদী। নালী বাজার থেকে উত্তর দিকে কিছু দূর আগানোর পরে মাওলার ঘাট বা তালতলা। এই মাওলার ঘাট দিয়ে নৌকায় ইছামতি নদী পার হয়ে দড়ি কয়রা দিয়ে রূপসা বাজার যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। মাওলার ঘাটে বর্তমানে ব্রিজ হয়েছে, এখন আর নৌকার প্রয়োজন হয়না। তবে একসময় মরহুম মাওলার নৌকা দিয়ে বা কখন বাঁশের পুল দিয়ে ইছামতি নদীর এই সংযোগ অতিক্রম করা হত।

ইছামতি নদীর পশ্চিম পাশ থেকে পূর্ব পাশে যাওয়ার সংযোগ সেতু ছিল বাঁশের পুল বা মাওলার নৌকা।



(২০১০ সালের গোহাইলবাড়ি গ্রামের পাশ দিয়ে যাওয়া রাস্তা। এই রাস্তা নালী বাজারে চলে গেছে। ইছামতি নদীর উপর কে আলী খান ব্রিজ।)

নালী বাজারের উত্তর দিকে রাস্তা দিয়ে মাওলার ব্রিজ (বর্তমানে যেখানে কে আলী খান ব্রিজ) অতিক্রম করে একটু আগালেই পূর্ব পাশে অর্থাৎ বাম পাশে গোহাইলবাড়ি গ্রাম এবং পশ্চিম পাশে অর্থাৎ ডান পাশে ইছামতি নদী, নদীর পশ্চিম পারে দড়ি কয়রা গ্রাম।

নালী বাজার থেকে উত্তর দিকে এই রাস্তা অবশ্য চলে গেছে গোয়ালখালী ও সৈয়দাবাদ পার হয়ে কাচারীঘাট বাজার দিয়ে পাটুরিয়া থেকে উখুলীর হাইওয়ে পর্যন্ত। পাটুরিয়া থেকে উখুলীর হাইওয়ে বা মহাসড়ক চলে গেছে রাজধানী ঢাকা পর্যন্ত। কিন্তু তৎকালীন সময়ে অর্থাৎ ১৯৯০/৯৫ সালে এই হাইওয়ে বা মহাসড়ক ছিলনা। নালী বাজার থেকে খুব চিকন এবং অনুচ্চ একটি ছোট রাস্তা কোন রকম চলে গিয়েছিল গোয়ালখালি পর্যন্ত। সেখান থেকে চকের ভিতর দিয়ে কোন রকম পায়ে হেটে উখুলী যাওয়া যেত, এতে অনেক সময় প্রায় এক দের ঘন্টা সময় লেগে যেত। সরাসরি কোন রাস্তা নালী থেকে উখুলি যাওয়ার মতন ছিলনা। ইছামতি নদী দিয়ে নৌকায় করে এই রাস্তা পার হতে হত।



(গোহাইলবাড়ি গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ইছামতি নদী, ২০১০ সালে তোলা ছবি)

গোহাইলবাড়ি গ্রামের প্রায় মাঝ বরাবর কদমতলা থেকে একটি হালট চলে গেছে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে খাল পর্যন্ত। এই কদমতলাই আসলে গোহাইলবাড়ি গ্রামের প্রবেশ পথ।

কদমতলা কিভাবে নামকরন হল তার পিছনে কিছু ঘটনা আছে। যেমন এখানে একসময় কে যেন কদম গাছ লাগিয়েছিল গ্রামের মানুষের বিশ্রামের কথা চিন্তা করে। সেই কদম গাছ এখানে এখনও আছে। বর্তমানে সেখানে বসার ব্যবস্থা ও পানি খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এছাড়া এই কদম তলার পাশে ইছামতি নদীর ঘাটে গ্রামের মানুষ এসে গোসল করে, গরু বাছুর গোসল করায়। বাচ্চারা নদীতে সাতার কাটে। বর্ষায় নদীতে বিভিন্ন ধরনের নৌকা চলে। দূর দূর থেকে ছান্দি নৌকাসহ বিভিন্ন নৌকা এই নদীতে আসে।

বর্ষায় এই ইছামুতি নদী যেন আপন বুক উচু করে দাড়ানোর চেস্টা করে। যেহেতু ঐ সময় নদী পথই ছিল একমাত্র যোগাযোগের উপযুক্ত ব্যবস্থা। তাই নদীতে লঞ্চ, ট্রলারসহ বহু ছোট বড় নৌকা চলতো।

(২০১০ সালে তোলা ইছামতি নদী গোহাইলবাড়ির লোকজন এখানে গোসল করেন।)




ইছামতি নদীর বর্ননা পরে আসবে।

যাইহোক এই প্রবেশ পথ অর্থাৎ কদম তলা থেকে গ্রাম শুরু হল। হালট দিয়ে নামতেই দুপাশে সবুজ ঘাসে ঘেরা ক্ষেত চোখে পড়ে, অবশ্য বর্তমানে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে।



(২০১০ সালে তোলা গোহাইলবাড়ি কদম তলার ছবি এই কদম তলার পুর্ব পাশে ইছামতি নদীতে লোকজন গোসল করে এবং গরু বাছুরও গোসল করায়।)




(২০১০ সালে তোলা গ্রামের মাঝে দিয়ে যাওয়া হালটের ছবি।)

গ্রামের প্রবেশের শুরুতে হালটের উত্তরদিকে অর্থাৎ  ডান পাশে প্রথম্ বাড়িটি মরহুম আব্দুস ছাত্তার মোল্লার এবং দক্ষিন পাশে অর্থাৎ বাম পাশের বাড়িটি পরেশ সাহা এর।



(গোহাইলবাড়ি গ্রামের প্রবেশ পথ, ২০২২ সালের ছবি)

হালট তখন অনেক নিচু ছিল। এরপরে ক্রমান্বয়ে মাটি দিয়ে উচু করা হয়েছে। বর্তমানে যত উচু দেখা যায় ঐ সময় তা কল্পনাও করা যেতনা। হালট থেকে সবার বাড়ি অনেক উচুতে ছিল।

এভাবে আব্দুস ছাত্তার মোল্লার পরে তার বড় ভাই মরহুম আফাজউদ্দিন মোল্লার বাড়ি। মরহুম আব্দুস ছাত্তার মোল্লার ছেলে আব্দুস ছালাম মাস্টার(রেজা, রাতুল, রিজভির  বাবা) বর্তমানে এই বাড়িতে থাকেন।



(মরহুম আব্দুস ছাত্তার মোল্লার বাড়ি )

মরহুম আফাজউদ্দিন মোল্লার ছেলেদের মধ্যে মোঃ নজরুল ইসলাম মিঠু মোল্লা (মেহেদী, তানজিম এর বাবা), নুরুল ইসলাম মোল্লা (নুপুর, আফরিন এর বাবা), আব্দুল খালেক বাচ্চু মোল্লা (আরাফাত, রুমা, ঝুমার বাবা), মোঃ চান মোল্লা (নাসির, আলমগীরের বাবা), চুন্নু মোল্লার ছেলে সেলিম মোল্লা, শামিম মোল্লা, আল-আমিন মোল্লা বর্তমানে এই বাড়িতে থাকেন।



মোঃ নজরুল ইসলাম মিঠু মোল্লা দাঁড়িয়ে আছেন নিজের বাড়িতে। পাশাপাশি ঘর। এর পশ্চিমে মোঃ আব্দুল খালেক বাচ্চু মোল্লার বাড়ি।




(ছবিতে মোঃ আব্দুল খালেক বাচ্চু মোল্লার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর ছেলে মোঃ ইয়াসিন আরাফাত।)

এই বাড়ির উত্তর দিকে কিছু বাঁশ গাছ আর বাড়ির ভিতরে কলা গাছ, পেঁপে গাছ, অল্প কিছু নারিকেল সুপারি আর আম গাছ ছিল। বাড়ির উত্তর পাশে একটি গভীর পুকুর ছিল। পুকুরে প্রাকৃতিকভাবে কিছু মাছ পাওয়া যেত। পুকুরের পুর্ব দিকে ঘন জঙ্গল আর কয়েকটি গুই সাপ বসবাস করতো।



(এটাই সেই পুকুর যা আব্দুল খালেক বাচ্চু মোল্লার বাড়ি দক্ষিনে অবস্থিত)

নিচের এই ছবিটির উত্তর দিকে মরহুম আব্দুস ছাত্তার মোল্লা ও মরহুম আফাজ উদ্দিন মোল্লার বাড়ি এবং দক্ষিন দিকে পরেশ সাহা এর বাড়ি।



(পরেশ সাহা তাঁর নিজ বাড়ির বারান্দায় বসে আছেন।)

(গোহাইলবাড়ি গ্রামের নতুন প্রজন্মদের ছবি। ছবিটি সম্ভবত ২০১৭/১৮ সালে তোলা।)



তারপরে সোজা পশ্চিম দিকে একটি ছোট আখের খেত ছিল অর্থাৎ ফাঁকা জায়গা ছিল। বর্তমানে যেখানে মরহুম আবু পাগলের বাড়ি। এখানে তখন ফাঁকা ও নিচু জায়গা ছিল। এই জায়গায় আখের চাষ করা হত, কখনও পালা গানের আয়োজন করা হত মরহুম আবু পাগলের পক্ষ থেকে।)

গ্রামের মাঝ বরাবর মরহুম আবু পাগলার বাড়ির সামনের হালটের ছবি। ছবিটি ২০১০ সালে তোলা।




বর্তমানে এখানে মরহুম আবু পাগলের ছেলেদের মধ্যে ছিদ্দিক আলী (ফাহিম এর বাবা), আলতাফ আলী (আশিক এর পিতা), আক্কাছ আলী (আয়নাল, ময়নাল, আব্দুল কুদ্দুস এর বাবা) বসবাস করেন।

এই বাড়িতে তুলনামুলক গাছ-পালা কম। কৃষি কাজে অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকায় সুর্যের আলো বা তাপের প্রয়োজন পরে, তাই এসব বাড়িতে গাছ-পালা কম থাকাই স্বাভাবিক ছিল।

মরহুম আবু পাগলের বাড়ির পশ্চিম পাশে জুলুমদ্দিন ও জিলমদ্দিন এর বাড়ি। জুলুমদ্দিন এর ছেলে আসলাম, ইছাক, রাজিব এবং জিলমদ্দিন এর ছেলে রাকিব বর্তমানে এখানে থাকেন।




(২০১০ সালে তোলা জুলুমদ্দিন এর বাড়ি।)

প্রত্যেকটি ঘর একটি অপরটির সাথে প্রায় লাগান। এই বাড়িতেও কিছুটা গাছ পালা কম ছিল।

প্রচুর সবুজ গাছপালা ছিলপুরো গ্রাম জুড়ে। প্রতিটি বাড়ির আনাচে কানাচে সবজি হত। এটেল মাটি ও দোআশ মাটিই ছিল বেশির ভাগ সারা গ্রাম জুড়ে। যারফলে প্রচুর গাছ পালা জন্ম নিত।

মোঃ ছামছের আলী (মোঃ ছকেল এর বাবা, সিয়াম। ছিফাত এর দাদা), মরহুম মনছের আলী ( মোঃ লুতফর এর পিতা, ইমতিয়াজ এর দাদা), মরহুম আনছের আলী ( বিল্লাল এর বাবা)-এরা সবাই সারি বেধে ছোট ছোট ঘর করে পাশাপাশি বসবাস করতো।




২০১০ সালে তোলা মরহুম মনছের আলীর ঘর সরাসরি দেখতে এসেছিলেন কাজি আব্দল খালেক (রতন)

গ্রামের মাঝে যে হালট ছিল সেই হালটে এটেল মাটি প্রচুর ছিল। বর্ষায় কাদা মাটি দ্বারা গ্রাম ভরে যেত। গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে মাটির ঘর ছিল অর্থাৎ মাটির বারান্দা, মেঝে এবং চারপাশ ছিল। ঘর গুলোতে ছনের পাতার ছাউনি, আখের পাতা বা বাঁশের চটার বেড়া ছিল।)



(গ্রামের প্রায় সব ঘর এরকম ছিল, ১৯৯০/৯৫ সালের কথা)

এই বাড়ির পশ্চিম পাশে সেই সময় কোন বাড়ি ছিলনা, ছিল একটি পুকুর। কিন্তু বর্তমানে এই বাড়ির পশ্চিমে মোঃ ফজল (মরহুম বাবর আলীর ছেলে, তুহিন এর আব্বা) ঘর তুলেছেন, তার পাশে বারেক আলী (সজিব এর বাবা), এরপরে আনোয়ার (লাইছা এর বাবা, আব্দুর রাজ্জাক এর বড় ছেলে থাকেন)।



(ছবিতে মরহুম মোঃ বাবর আলীর স্ত্রী, ফজলের মা ও তুহিনের দাদির ছবি)

কদম তলা থেকে হালট হয়ে গ্রামের সোজা পশ্চিমে ডান পাশে ২ টি বাড়ি আছে। একটি হল কৃষ্ণ সাহাদের (মৃত ঘটু সাহার বড় ছেলে) অপরটি পশ্চিম পাশে জাহিদ, শহীদদের ( মোঃ হায়াত আলীর ছেলে)।

কদমতলা থেকে হালটের দক্ষিন দিকে পরেশ সাহা (যমুনা, কামনা ও সীমার বাবা) এর বাড়ি। প্রচুর গাছ গাছালি ছিল একসময় এই বাড়িতে। বাঁশ গাছ, আম গাছ, নারিকেল গাছ, সুপারি গাছসহ অনেক অজানা গাছ এই বাড়িতে ছিল।

এই বাড়ির পরে গৌরাঙ্গ সুত্রধর, নিমাই সুত্রধর (অসীম এর বাবা) দের বাড়ি। গৌরাঙ্গ সুত্রধরের বাবা ও নিমাই সুত্রধরের বাবা তারা কেউ এখন বেঁচে নেই।

ফেলা সুত্রধর (শান্তির বাবা), সুজনদের বাড়ি, তারপাশে দক্ষিন দিকে বিকর্ন চৌধুরীদের বাড়ি, তারপরে বরুন রায় (বাবুল রায় এর ছেলে) দের বাড়ি। আরো পশ্চিম দিকে দেবেশ সাহা (রনি ও জনির বাবা) ও আরো কিছু হিন্দু বাড়ি- এই হল মোট গোহাইলবাড়ি হিন্দু বাড়ির সংখ্যা।



(ফেলা সুত্রধরের বাড়ি, বসে আছন ফেলা সুত্রধর)

গৌরাঙ্গদের বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের গাছ ছিল, এখনো আছে। গৌরাঙ্গ বর্তমানে ঢাকা থাকেন, গ্রামের বাড়িতে কেউ থাকেনা। সে নালী হাই স্কুলের একজন মেধাবী ছাত্র ছিল, পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। আর্থিকভাবে খুবই ভাল অবস্থায় আছেন কিন্তু বাবা-মা এই সু-অবস্থা দেখে যেতে পারেননি।

হিন্দু সম্প্রদায়ের ২/১ টি পরিবার বাদে প্রায় সবার আর্থিক অবস্থা ভালই ছিল। তাদের জমিজমা ও অনেক বড় বাড়ির পাশাপাশি নালী বাজারে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ছিল। যেমন, বাবুল রায় (মৃত কামাক্ষা রায়) দের নালী বাজারে বিরাট ব্যবসা ছিল, বর্তমানেও আছে। গোহাইলবাড়ি গ্রামে হিন্দুদের মধ্যে এই বাড়ির লোকজনদের অনেক প্রভাব ও সম্মান ছিল। এই বাড়ির চারদিকে প্রচুর বাঁশের ঝাড় ছিল, কিছু আম গাছ, কাঠাল গাছ,সুপারি গাছ, নারিকেল গাছ ছিল। এই বাড়ির দক্ষিন দিকে একটি বিরাট পুকুর রয়েছে।

গোছল করার কাজের পাশাপাশি কিছু মাছের চাষও এই পুকুরে করা হয়।

এছাড়া বিকর্ন চৌধুরী (মৃত নীল রতন চৌধুরীর বড় ছেলে) দের অনেক সম্পত্তি ও সম্মান রয়েছে। বিকর্ন চৌধুরী বর্তমানে সরকারের অনেক বড় পদে পুলিশে চাকুরি করেন। এই বাড়ির উত্তর দিকে একটি পুকুর আছে। পুকুরে মাছের চাষ না করলেও প্রাকৃতিকভাবে কিছু মাছ এমনিতেই পাওয়া যেত।

এই বাড়িটি গোহাইলবাড়ি গ্রামের মধ্যে আয়তনে বড় বাড়িগুলোর একটি। এই বাড়ির পুর্বে বিরাট বনের মতন রয়েছ। সেখানে বড় বড় আম গাছ, জাম গাছ, জামরুল গাছ এখনও আছে।

এই দুই পরিবার হিন্দুদের মধ্যে আর্থিকভাবে এবং পতিপত্তির দিকে এগিয়ে ছিল, এখনও আছে।

গ্রামের একেবারে দক্ষিনে মুছলমান বাড়ির মধ্যে শেখ বলাই (রাজ্জাক এর পিতা) এর বাড়ি। এই বাড়ি আয়তনে দিকে অনেক বড় ছিল বিশেষ করে মুছলমান বাড়ি গুলোর মধ্যে। এই বাড়িতে অনেক গাছ-গাছালি ছিল, এখনও আছে। শেখ বলাই (রাজ্জাক, রাজিব এর পিতা) তিনিও খুব সাহসী মানুষ ছিলেন।

নালী বাজার থেকে গ্রামে ঢুকতেই শুরুতে রাস্তার সাথে সংযোগ সড়ক দিয়ে প্রথম বাড়িটিই ছিল কাজি বাড়ি।

(নালী বাজার থেকে গোহাইলবাড়ি গ্রামে প্রবেশের শুরুতেই চোখে পড়বে এই পুকুর। ২০১০ সালে পুকুররে অবস্থা, এই পুকুরটি কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এর।)

কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এর বাড়ি। এই বাড়িতে অবশ্য উনারা থাকতেননা। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসতেন। কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এর বাবা এবং মায়ের কবর রয়েছে এই বাড়িতে। চার দিকে অনেক আম গাছ, নারিকেল গাছ ছিল একসময়। মরহুম ওছিমদ্দিন (ইখলাছ মামা এর পিতা এবং শফি, সবুজ, বিদ্যুতের দাদা) এই বাড়িতে থাকতেন। বাড়ি দেখাশুনা করতেন। পরবর্তীতে ইখলাছ উদ্দিন এই বাড়িতে পরিবারসহ ছিলেন। উনি দীর্ঘ দিন বসবাস করেছেন। মূলত

ইখলাছ উদ্দিন যখন এই বাড়িতে ছিলেন তখনই গ্রামের উন্নয়নে কাজি আব্দুল খালেক (রতন) বিরাট ভুমিকা পালন করেন।




(২০১০ সালে জনাব কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এর গ্রামের বাড়ি।)

এই বাড়ির সাথে লাগানো দক্ষিনের বাড়িটি ছিল কাজি রফিকুল ইসলাম (মরহুম কাজি আশরাফুল ইসলাম এর পুত্র) এর বাড়ি।

বর্তমানে এই বাড়িতে রফিকুল ইসলাম এর বোন কাজি ফরিদা আক্তার তার মাকে নিয়ে থাকেন। এই বাড়িতে প্রচুর ফলমূলের গাছের পাশাপাশি বিড়ল প্রজাতির কিছু গাছ রয়েছে। অনেক বড় এরিয়া নিয়ে এই বাড়ি। বাড়ির পুর্ব দিকে রাস্তার সাথে একটি বিশাল পুকুর রয়েছে। পুকুরে বিভিন্ন প্রকার মাছের চাষ হয়।

কাজি রফিকুল ইসলাম এর বাড়ির ঠিক দক্ষিনে রয়েছে বাবন সাহা (মৃত আশুতোষ সাহা) এর বাড়ি। প্রচুর গাছে ঘেরা এই বাড়ি। এত বড় বড় গাছ দিয়ে ঘেরা এই বাড়ি যে দূর থেকে ঘর বাড়ি কিছুই দেখা যায়না।

খুব নিরব, গাছ পালায় ঘেরা এই বাড়ি। এই বাড়ির পশ্চিম দিকে একটি ছোট পুকুর আছে।

গ্রামের পশ্চিম পাশে রয়েছে একটি বড় খাল। এই খাল লম্বায় অনেক হলেও প্রশ্বস্তা তেমন ছিলনা। যখন খালে পানি কম থাকতো তখন নৌকা, পুল ছাড়াও পার হওয়া যেত। কিন্তু যখন পানি বেশি হত অর্থাৎ বর্ষাকালে খালের উপর বাঁশের পুল বা নৌকা দিয়ে পার হতে হত।

এই খালটি দক্ষিনে ধুতরাবাড়ি, পাটুরিয়া হয়ে পদ্মা নদীতে গিয়ে মিশেছে। পদ্মা নদী থেকে এই খাল শুরু হয়ে পাটুরিয়া দিয়ে উত্তর দিকে ধাবিত হয়ে গোহাইলবাড়ি গ্রামের পশ্চিমে চকের মধ্যে দিয়ে পূর্ব-উত্তর দিকে বেঁকে ইছামতি নদীতে এসে শেষ হয়েছে।



(২০২৫ সালে তোলা খালের ছবি)

সাধারণত গীস্মকালে যাতে চকে পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা করা যায় সেই চিন্তা থেকে এই খালের উৎপত্তি হয়েছিল। খালের পানি দিয়ে চকের ভিতরে চাষ কাজে যাতে পানি পাওয়া যায় এটাই ছিল পরিকল্পনা। পানির পাশাপাশি এই খালে বর্ষাকালে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত।

গ্রামের মানুষ বর্ষাকালে বিভিন্নভাবে এই খাল থেকে মাছ আরোহন করতো। যেমন জাল দ্বারা, বর্শি দ্বারা, বাঁশের চটা দিয়ে তৌরি ঘের দ্বারা, হাত দ্বারা ইত্যাদি।

বন্যায় কখনও কখনও নিজের বাড়ির উঠানে দাড়িয়েও লোকজন বর্শিসহ বিভিন্ন জিনিস দ্বারা মাছ আরোহন করতো।






(১৯৯০ সালে বা আরও আগে থেকে এসব বাঁশের তৌরি উপকরন (দুয়ারি) দিয়ে, বর্সি দিয়ে গ্রামের মানুষ মাছ শিকার করতো।)

এই খালের উত্তর পাশেও কিছু গোহাইলবাড়ি গ্রামের মুছলমান পরিবার বাস করতো। তাদের বর্ননা সামনে আসবে।

খালের দক্ষিন পাশে অর্থাৎ মূল গোহাইলবাড়ি গ্রামে আরো কিছু লোক বাস করতো।

যেমন খালের সাথে লাগান নালী থেকে আসা রাস্তার সাথে বসবাস করতো মোঃ নিজামউদ্দিন, তার ভাই মাইনদ্দিন, আইনদ্দিনসহ আরো কিছু মানুষ।




(মোঃ নিজাম উদ্দিন, ২০১০ সালে সম্ভবত, জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন এর সুদবিহীন লোন দেওয়ার অবদান সম্পর্কে কথা বলছেন।)

এসব বাড়িগুলো খব ছোট ছোট ছিল। বাড়িতে উল্লেখযোগ্য তেমন বড় গাছ-পালা ছিলনা। এই বাড়ির লোকজন কৃষিকাজ বা শিবালয় বাজারে হকারির কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

এই বাড়ির সাথে পশ্চিমে ছিল ছকেল মোল্লা মাতবরের বাড়ি। এই বাড়ির দক্ষিন পাশে মুরহুম আদম আলী (রিপন, তপন, স্বপনদের পিতা) এর বাড়ি। এই বাড়িতে বর্তমানে রিপন আলী বসবাস করেন।

মরহুম আদম আলীর বাড়ির পুর্ব দিকে মোঃ আফছার আলীর বাড়ি (রাফিদ রতন এর বাবা), এর পাশে মরহুম শেখ ঘটু, মরহুম শেখ বিনাত (ফরহাদ, আলিম, ওলী এর পিতা) দের বাড়ি।



(মোঃ আফছার আলীর বাড়ি, ছবিতে আফছার আলীর স্ত্রী এবং রাফিদ রতন এর মা দাঁড়িয়ে আছেন। জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন থেকে তাঁর অনেক সাহায্য পেয়েছেন, গরু কেনা, ব্যবসায় লোন, ঘর তোলাসহ বিভিন্ন সময়ে সাহায্য পেয়েছেন।)

মোঃ মনোরদ্দিন (আমজাদ, মুন্নাফ এর পিতা), মরহুম আব্বাছ আলী (লতিফ, রনির পিতা)- উনাদের বাড়ি একেবারে নালী বাজার থেকে আসা রাস্তার সাথে। রাস্তার সাথে আরো কিছু বাড়ি আছে যেমন মোঃ মুরাদ মোল্লা (রতন, মানিকের বাবা) এর বাড়ি, তার পাশে বিল্লাল, রুবেল (মরহুম ওছিমদ্দিন এর নাতি) এর বাড়ি। উল্লেখযোগ্য তেমন গাছ-পালা এসব বাড়িতে ছিলনা।

তবে মরহুম আব্বাছ আলীর বাড়ির পশ্চিমে মরহুম কুকিলা এর ছোট ছেলে মোঃ ছোহরাব (মোঃ মামুন এর  পিতা) এর বাড়িতে প্রচুর গাছ-পালা রয়েছে। বড় গাছের মধ্যে তাল গাছ, আম গাছ, বাঁশের ঝাড়, সুপারি গাছসহ অনেক গাছ রয়েছে।



(ছবিটি মোঃ ছোহরাব এর স্ত্রী ও মামুনের মায়ের, নিজ বাড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন, উনারা বিভিন্ন সময়ে জনাব কাজি আব্দুল খালেক থেকে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য পেয়েছেন, সুদবিহীন লোন পেয়েছেন।)

মামুনদের বাড়ির সাথে উত্তরে মরহুম মোছলেম এর ছেলে মনির (আসিফ এর বাবা) এর বাড়ি।



(মরহুম মোঃ মোছলেম এর ছেলে মনিরের বাড়ি, ছবিতে মোঃ অন্তর। বর্তমানে মোঃ মনির ও তাঁর ছেলে অন্তর ও আসিফ এই বাড়িতে বাস করেন।)

তার পাশে মরহুম মোহন মোল্লা (শহীদুল, হায়দারের পিতা) এর বাড়ি। ।



(মরহুম মোঃ মোহন মোল্লার বাড়ি, বর্তমানে তাঁর ২ ছেলে শহীদুল ও হায়দার এই বাড়িতে বসবাস করেন।

এই বাড়ির পশ্চিমে ইখলাছ উদ্দিন (শফি, সবুজ, বিদ্যুতের পিতা) এর বাড়ি। তার পাশে হারুন মোল্লা ( রাজ্জাক এর পিতা), তারপাশে মুরহুম আব্দুল খালেক (মাসুদ, জাহিদ, সাইদ এর বাবা) এর বাড়ি, তার উত্তরে বিল্লাল, দুলালদের বাড়ি।



(মোঃ ইখলাছ উদ্দিনের বাড়ি, এই বাড়িতে বর্তমানে তাঁর তিনছেলে মোঃ মামুন মোল্লা শফি, সবুজ ও বিদ্যুৎ বসবাস করেন।)

এই বাড়ির পশ্চিমে মরহুম আকবার (মুজিবর ও আহাম্মদ আলীর বাবা) এর বাড়ি। উনাদের অনেক জমিজমা ছিল। এখন একটু আর্থিকভাব দূর্বল। এই বাড়িতেও  প্রচুর বাঁশ গাছসহ অন্যান্য কিছু গাছ রয়েছে। এই বাড়ির উত্তর দিকে বিরাট চক ও বাঁশ গাছের ঝাড় রয়েছে।



(মোঃ আহাম্মদ আলীর বাড়ি, এই বাড়িতে তিনি তাঁর দুই ছেলে নাইম ও ফাহিমকে নিয়ে বসবাস করেন।)

মরহুম আকবার আলীর বাড়ির পশ্চিমে তার আপন ভাই মরহুম মোঃ হোসেন আলীর বাড়ি। মরহুম হোসেন আলীর ছেলে আওলাদ হোসেন, আতাউর রহমান, আব্দুল আলিম, বাদশা ও রাজা বর্তমানে এই বাড়িতে বসবাস করেন।



জমিজমার দিক দিয়ে ও ক্ষেত চাষ বাসের দিকে এই বাড়ি গ্রামের মধ্যে সবচাইতে ব্যস্ততম একটি বাড়ি। এই বাড়ির পশ্চিমে খাল ও খালের ঐ পারে বিড়াট চক রয়েছে। এই বাড়িতেও কিছু বড় গাছ রয়েছে।

গ্রামের প্রবেশ পথ সোজা পশিম দিকে কিছু দূর যাওয়ার পরে বিল্লাল (মরহুম আনছের আলীর ছেলে) এর বাড়ির উল্টা দিকে আব্দুল জলিলের বাড়ি (মাসুদ, শাহআলম এর বাবা) এবং তার ভাই মরহুম বাবর আলী (আব্দুর রাজ্জাক, আব্দুল বারেক, ফজল এর বাবা, তুহিন, ছাব্বির এর দাদা) এর বাড়ি।

এই বাড়ির দক্ষিনে মেহেদি হাসান ও মোঃ হানিফ (জুমাত আলীর ছেলে) এর বাড়ি। তারপাশে পূর্বে নুরুল ইসলাম (বিনাত আলীর ছেলে) এর বাড়ি।



( মোঃ জুমাত আলির বাড়ি, বর্তমানে এই বাড়িতে তাঁর ছেলে মেহেদী হাসান ও মোঃ হানিফ বসবাস করেন।)



(মোঃ বিনাত আলির ছেলে মোঃ নুরুল ইসলাম এর বাড়ি। বর্তমানে ২০২৫ সাল, এই বাড়িতে তাঁর দুই ছেলে ফাহিম, তামিম এবং দুই মেয়ে বাস করেন।)

এই বাড়ির পশ্চিমে বর্তমানে মসজিদ নির্মিত হয়েছে। গোহাইলবাড়ি জিরাতুননেছা জামে মসজিদ।



(২০২১ সালের এপ্রিল মাসে নির্মিত হয়েছে এই মসজিদ।)

মসজিদের পশ্চিমে মরহুম মোস্তফা (রাহুল এর বাবা) ও আব্দুল (শাহিন এর বাবা) এর বাড়ি। এই বাড়ির সাথে লাগানো মরহুম চান্দাই এর বাড়ি, তারপাশে মরহুম আখতার মোল্লা এর বাড়ি। মরহুম আখতার মোল্লা (জসিম এর নানা) সৎ ও সাহসী একজন মুছলমান ছিলেন। আর্থিক সমস্যা থাকলে ইসলামি আকিদার প্রশ্নে তিনি কখনও কাউকে ভয় করতেননা। এই বাড়িতে বর্তমানে তার ছেলে ফজলুল হক এবং তার নাতি জসিম বসবাস করেন।

মোঃ জসিম উদ্দিন বর্তমানে নানা বাড়িতে জায়গা কিনে বা মায়ের সুত্রে কিছু জমি পেয়ে বাড়ি তোলার চেষ্টা করছে। এখনও এই বাড়ির কাজ চলছে। কারণ এটা একটি ছোট পুকুরের মতন ছিল।

পুকুর ভরে তারপরে ঘর-বাড়ি নির্মানের কাজ চলছে, ফলে একটু সময় লাগাই স্বাভাবিক। জসিম এখন ঢাকায় থাকে, ভাল জবে করেন। আর্থিক অবস্থা দিন দিন উন্নতি হচ্ছে। জসিম যখন স্কুল জীবনে ছিল গ্রামের অন্যান্য ছেলেদের মতন সেও পড়াশুনা বাবদ জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন থেকে সহযোগিতা পেয়েছিলেন।



(মোঃ জসিম উদ্দিন বাড়ি করার চেষ্টা করছে, ইনশাআল্লাহ কয়েকমাসের মধ্যে হয়তো ঘর নির্মানের কাজ শুরু হবে।)

এই বাড়ির পশ্চিমে এই গ্রামে নতুন বসতি হিসাবে মোঃ দুলাল ( সুজন ও সুরুজের পিতা) এবং শহীদ নামে কয়েকজন লোক বাস করে। গ্রামের মাঝে নতুন বসতি হিসাবে মরহুম মোখতার নামে আরেকজন ব্যক্তি দুলাল, বিল্লালদের বাড়ির উত্তর পাশে বাস করে থাকেন।

এই হল মুটামুটি গোহাইলবাড়ি গ্রামে বসবাসকারী খালের এই পারের অর্থাৎ খালের দক্ষিন পাশে বসবাসকারি মানুষের বর্ননা।

খালের উত্তর পাশে বসবাসকারী গোহাইলবাড়ি গ্রামের কিছু মানুষের আলোচনা হবে।

গোহাইলবাড়ি গ্রামের পশ্চিম পাশে বয়ে যাওয়া খালটি ধুতরাবাড়ি হয়ে গ্রামের চক দিয়ে গ্রামের উত্তর দিকে বেকে গিয়ে ইছামতি নদীতে গিয়ে মিশে গেছে।

এই যাওয়ার পথে রয়েছে নালী বাজার থেকে আসা সেই রাস্তা যা এই খাল পার হয়ে সৈয়দাবাদ ও গোয়ালখালী হয়ে উখুলী মহাসড়কে যোগ হয়েছে।

এই রাস্তার সংযোগে খালের উপর বর্তমানে ব্রিজ রয়েছে। ব্রিজটি মূলত রাস্তার সংযোগ এবং গ্রামের সংযোগ হিসাবে কাজ করছে। এই ব্রিজ একসময় ছিলনা। অর্থাৎ ১৯৯০/৯৫ সালে এই ব্রিজটি ছিলনা। তখন লোকজন এখানে বাঁশের পুল দিয়ে যাতায়াত করতো বা কখনও ছোট নৌকা দিয়ে এপাশ থেকে ঐ পাশে যাতায়াত করতো। তবে বন্যার সময় বা অতিবৃষ্টিতে এই যাতায়াত অনেক বিপদজনক হয়ে যেত।



( এই ব্রিজটি গোহাইলবাড়ি গ্রামের পূর্বে নালী থেকে যাওয়া উখুলী পর্যন্ত সংযোগ সড়ক হিসাবে নির্মিত হয়েছিল। )

খালের উত্তর পাশে গোহাইলবাড়ি গ্রামে যারা বসবাস করতো তাদের মধ্যে শুরুতেই ছিল কিছু চামার বাড়ির লোকজন। তারা প্রায় ৩/৪ টি পরিবার একত্রে এক জায়গায় বাস করতো।

এরপরে উল্লেখযোগ্য বাড়ির মধ্যে মোঃ বাবলু (সাদ্দাম এর বাবা) এর বাড়ি। উনাদের আর্থিক অবস্থা আগে থেকেই খুব ভাল ছিল। জমিজমাসহ নালী বাজারে দোকান পাট ও ব্যবসা বানিজ্য ছিল। এই বাড়ি পশ্চিমে জুমাত মেম্বার এর বাড়ি (মোঃ বাতেন আলীর বাবা, টুকুর দাদা), মরহুম রহমত আলী (রহিম ডাক্তার ও রফিকুল ইসলাম এর বাবা), তারপরে আব্দুল আলিম, মোঃ ইঞ্জিনার রাশেদদের বাড়ি। এভাবে বছর উদ্দিন এর ছেলে মোঃ মিলনদের বাড়ি। তারপাশে আব্দুল খালেক এর বাড়ি। আরো উত্তরে মরহুম হোসেন আলী (মোঃ মশিউর রহমান মনির এর বাবা), এই বাড়ির উত্তরে মরহুম

শাহাজদ্দিন মাতবার এর বাড়ি। এসব বাড়িকে কেউ কেউ গোয়ালখালির মধ্যে মনে করতো। এখান থেকে পুর্ব দিকে রাস্তা পর্যন্ত প্রায় সবাই মুছলিম পরিবার।

এরা সবাই আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ছিলেন, বর্তমানেও আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল।এসব বাড়ির উত্তরে মরহুম শেখ জামাল (আক্তার এর বাবা), হাশেম মোল্লা সহ বেশ কিছু মুসলিম পরিবার ছিল যাদের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিলনা।

২। তৎকালীন (১৯৯০/৯৫ সালে গোহাইলবাড়ি গ্রামের মরহুম বিভিন্ন মানুষ

(চিন্তা চেতনা, পোশাক পরিচ্ছদ, ধর্মীয় জ্ঞান, আর্থিক অবস্থা, পেশা ইত্যাদি)

মরহুম আব্দুস ছাত্তার মোল্লা

(ছালাম মোল্লা মাস্টার)

গোহাইলবাড়ি গ্রামে প্রবেশ করতেই প্রথম যে বাড়িটি চোখে পড়ে এই বাড়ির তৎকালীন মালিক ছিলেন মরহুম আব্দুস ছাত্তার মোল্লা। বর্তমানে তার ছেলে এই বাড়িতে ৩ সন্তান (রেজা, রাতুল, রিজভি) নিয়ে বসবাস করেন।

মরহুম আব্দুস ছাত্তার মোল্লা একজন নামাজী মানুষ ছিলেন। তিনি নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন। তবে অধিকাংশ সময় নিজ ঘরে নামাজ আদায় করতেন। তার এক ছেলের পাশাপাশি ৬ জন মেয়েও ছিল। তাদেরকে তিনি বিয়ে দিয়েছেন, ছেলেকে মাস্টার্স পাস করিয়েছেন বলে গর্ববোধ করতেন।

এই ব্যক্তি জীবনে অধিকাংশ সময় কাপড়ের ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। রাজবাড়িতে কাপড়ের ব্যবসার করেন যাতায়াত করতেন। আর্থিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল না হলেও মুটামুটি চলে যেত।

নদীর পূর্ব পারে মরহুম মোঃ বশির মোল্লার কাপড়ের দোকানেও কাজ করেছেন কিছু দিন। এরপরে অবসরে নিজের বাড়িতে থাকতেন। বাড়ির বিভিন্ন ফলমূল যেমন কলা, আম, সুপারি, কাঠাল, বেল, বাদাম ইত্যাদি নালী হাটের দিন বিক্রয় করতেন। এছাড়া উনার মাছ ধরার অভ্যাস ছিল। ইছামতি নদীতে তিনি বর্শি দিয়ে মাছ ধরতেন। শখের বসে এসব কাজ করতেন। তিনি ভাল পুথি পড়তে জানতেন। এটাও ওনার একটি শখ ছিল। বাড়ি বাড়ি যেয়ে পুথি পড়তেন।

নিজে নিয়মিত নামাজি হলে গান-বাজনা পছন্দ করতেন। যেমন গ্রামের মধ্যে যখন আবু পাগলের বাড়িতে পালা গান হত তখন তিনি শুনতে সেখানে যেতেন। পায়জামা, লুঙ্গি পড়তেন। মুখে দাড়ি ছিল, সব সময় সুন্দর হয়ে থাকার চেস্টা করতেন। গ্রামের মধ্যে মোল্লা হিসাবে নামডাক ছিল, যদিও পেশা হিসাবে কখনও মোল্লার কাজ করতেননা।

কাজি আব্দুল খালেক (রতন) যখন গ্রামে সাহায্য সহযোগিতা দেওয়া শুরু করলেন তখনও তাঁর অবস্থা তেমন খারাপ ছিলনা। তবে কিছু সহযোগিতা তাঁর মেয়েদের বিয়ে ও ছেলের পড়াশুনা বাবদ করেছিলেন বলে ধারনা পাওয়া যায়।

মরহুম আব্দুস ছাত্তার মোল্লা আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। বাজার থেকে নিজ সন্তানদের জন্য প্রচুর বাজার করতেন, তাদেরকে খাদ্য-পোশাকে ভাল রাখার চেস্টা করতেন। নিজের পিতা মরহুম আব্দুর রহিম মোল্লা অনেক সম্পদের মালিক ছিলেন বলে নিজেরা খুব গর্ব করতেন। আশে পাশের অনেক জমিজমা তাদের ছিল বলে দাবি করতেন।

উনার গায়ের রঙ শ্যমলা ছিল, মুখে পাতলা ও লম্বা দাড়ি ছিল, দেহের গরন পাতলা ও লম্বা ছিলেন। নিজের নামাজ পড়লেও কাউকে তেমন চাপ দিতেননা নামাজের জন্য। মেয়েদের তেমন পর্দার প্রতি গুরুত্ব না দিলেও পর্দা জরুরী বলে মনে করতেন।



(এই ছবিতে মুখে দাড়ি ও চশমা পড়া মরহুম মোঃ আব্দুস ছাত্তার মোল্লা, তিনি ২০২০ সালে ইন্তেকাল করেন। নিচে ২০১০ সালে তোলা তাঁর বাড়ির সামনের ছবি।)




উনার বাড়িতে একসময় অনেক আত্বীয় স্বজনদের আসা-যাওয়া ছিল। তিনি নিজের আত্বীয়দেরকে প্রচুর সমাদর করতেন। ২০২০ সালে করনার সময় উনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর ছেলে আব্দুস ছালাম মাস্টার সরকারি জব করেন, আর্থিক সমস্যা এখন এই পরিবারে নেই।

মরহুম মোঃ মোহন মোল্লা

(শহীদুল, হায়দার)

কাজি আব্দুল খালেক  (রতন) থেকে যেসব মানুষ সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছিলেন মরহুম মোহন মোল্লা তাঁর মধ্যে একজন।

মরহুম মোহন মোল্লা মরহুম আফাজ উদ্দিন মোল্লার ছেলে। যখন কাজি আব্দুল খালেক (রতন) সহযোগিতা দেওয়া শুরু করেন তখন তিনি নালী বাজারে হাটের দিন খেজুরের গুড় ক্রয়- বিক্রয় করতেন।

খুব সাহসী মানুষ ছিলেন। লম্বা, স্বাস্থ্য ভাল ছিল, গায়ের রঙ শ্যামলা ও মাঝারি গরনের ছিলেন। খুব মোটাও না আবার একেবারে চিকনও না। পড়নে ফতুয়া টাইপ জামা, হাফ হাতা জামা, লুঙ্গী পড়তেন।

মুখে সব সময় হাসি লেগেই থাকতো। এছাড়া গ্রামের মাতবর ছিলেন। সবাই যেকোন সমস্যায় উনার কাছে আসতেন, উনি সাহস দিতেন, সবার পাশে থাকতেন।

নিজে তেমন নামাজী নাহলেও নামাজীদেরকে সম্মান করতেন। কাউকে ভয় পেয়ে উচিৎ কথা বলা থেকে বিরত থাকতেননা।




(২০১০ সালে তোলা ছবিতে মরহুম মোঃ মোহন মোল্লা। কাধ বাবরি চুল, কাঁধে গামছা, পড়নে হাফ হাতা জামা গায়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।) ২০১৪ সালে উনি ইন্তেকাল করেন।)

উনার ২ ছেলে ৪ মেয়ে। দুই ছেলে শহিদুল ও হায়দার। তখন ওরা খুব ছোট ছিল। মেয়েদের মধ্যে মর্জিনা সবার বড়, এরপরে নার্গিস, বিলকিস ও বন্যা। বর্তমানে সবাই ভাল আছে। ৪ মেয়ে বিবাহিত। শহীদুল ঢাকায় জব করে, হায়দার নালী বাজারে মোটর মেকানিকস এর কাজ করে।

মরহুম মোহন মোল্লা যতদিন বেঁচে ছিলেন আর্থিক সমস্যা প্রচুর ছিল। উনি ব্যবসার জন্য কাজি আব্দুল খালেক (রতন) থেকে লোন নিয়েছিলেন। গুড়ের ব্যবসা, পরবর্তিতে চায়ের দোকানসহ বিভিন্ন কাজ করেছেন।

এছাড়া গরু নিয়েছিলেন পালন করে বড় করে বিক্রি করে লাভবান হবেন এই আশায়। নিজের বাড়িতে কাজি আব্দুল খালেক (রতন) থেকে টিন নিয়ে ছিলেন ঘর উঠানোর জন্য।

যাইহোক, বর্তমানে এই বাড়ির অবস্থা ভাল। বাড়িতে টিনের বড় দুইটি ঘর রয়েছে। আর্থিক অবস্থাও বেশ ভাল, কারন সবাই এখন কর্মজিবি।

২০১৪ সালে হঠাৎ করে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের পুর্ব পর্যন্ত দারিদ্রতার সাথে লড়াই করেছেন। কিন্তু কখনও মনোবল হারাননি। তাঁর ২ ছেলে বর্তমানে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী, হয়তো আজ বেঁচে থাকলে কিছু আনন্দ অন্তরে অনুভব করতেন, মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন।

মরহুম মোঃ মোহন মোল্লার মতন অনেক মানুষের পরিবারে আজ আর্থিক সমস্যা নেই, কিন্তু সেই মানুষগুলো সেই সুখের দিন দেখে যেতে পারেননি। এদের পরিবারের সবার আজকের এই অবস্থানের পিছনে কিছুটা হলেও ভুমিকা রয়েছে কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এর।

মরহুম মোঃ মোছলেম

(মনির, অন্তর, আসিফ)

মরহুম মোঃ মোছলেম গোহাইলবাড়ি গ্রামের একজন সহজ ও সরল মানুষ ছিলেন। দেখতে মোটাসোটা ও ফর্সা, মুখে সবসময় হাসি লেগেই থাকতো। উনাদের বাড়িটি মরহুম মোহন মোল্লার বাড়ির সাথে লাগানো উত্তর পাশে ছিল। বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের ফসলের চাষ করতেন তার মধ্যে আখের চাষ অন্যতম।

তিনি তেমন লেখাপড়া জানতেননা কিন্তু সবার সাথে মিলে মিশে চলতেন। পেশা হিসাবে উনি শীতের সময় খেজুর গাছের রস দিয়ে খেজুরের গুড় বানিয়ে বিক্রয় করতেন।
গ্রামের মধ্যে যেসব বাড়িতে খেজুর গাছ ছিল তিনি তাদের সাথে শীত মৌসুম এলেই চুক্তি করতেন।
চুক্তি অনুযায়ী খেজুর গাছের উপরের দিকের ডালপালা কেটে রস সংগ্রহের প্রস্তুতি নিতেন। রসের কিছু অংশ খেজুর গাছের মালিককে দিতেন বাকিটা নিজে নিয়ে খেজুরের গুড় বানানোর ব্যবস্থা করতেন।
উনার বাড়িতে ভোরবেলা থেকেই খেজুরের রস জ্বাল দেওয়া হত। শীতের তীব্রতা থেকে বাঁচার জন্য অনেকেই ঐ বাড়িতে যেখানে রস জ্বাল দেওয়া হত তার আশে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতো। অনেক সময় তিনি লোকজনদেরকে রস খাওয়াতেন বা গুড় থেকে কিছু গুড় খেতে দিতেন।
নালী বাজারে এসব গুড় তিনি পাইকারি বা খুচরা বিক্রি করতেন।
কিছু জমিজমা উনার ছিল যা উনি চাষ করে চলার চেস্টা করতেন তবে নগদ টাকা হাতে খুব কমই থাকতো। যারফলে সংসারে অভাব অনটন সব সময় লেগেই থাকতো। উনার বাড়িতেও ঐ সময় আখের পাতা দিয়ে ঘর ছিল যে ঘরে উনি থাকতেন। উনার ১ মেয়ে ১ ছেলে ছিল।
এছাড়া গরু পালন করতেন, গরুর দুধ বিক্রি করে সংসার চালানোর চেস্টা করতেন। ছেলে-মেয়েদেরকে আর্থিক সমস্যার কারনে লেখাপড়া করাতে পারেননি।

এই ব্যাক্তিও কাজি আব্দুল খালেক (রতন) থেকে ঘর তোলার জন্য টিন নিয়েছিলেন। টিন নিয়ে নিজের ঘরের চাল হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। এর পুর্বে উনার বাড়িতে টিনের ঘর ছিলনা।)



(২০১০ সালে তোলা ছবি, মরহুম মোঃ মোছলেম উদ্দিনের বাড়ি।)

ঘরের স্বপ্ন পুরনের পর নিজের স্বাবলম্বীর জন্য গরু কিনার জন্য টাকা নিয়েছিলেন। এই গরুকে লালন পালন করে বড় করে একদিকে যেমন তাঁর দুধ বিক্রয় করা যাবে অন্যদিকে গরু বিক্রি করে অনেক টাকাও পাওয়া যাবে যা দ্বারা আরেকটি ছোট বাছুর কিনে যাবে স্বল্প মুল্যে।
এভাবে গরু পালন তাঁর সংসারের অর্থনৌতিক অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ও উন্নতি এনে দিয়েছিল।

উনি জীবনের শেষ দিকে ডায়বেটিস রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মাঝে মাঝে দেখা হত বাড়িতে গেলে। নিজের অসুস্থতার কথা বলতো। নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দিতাম।

কয়েক বছর আগে উনি ইন্তেকাল করেছেন। সারা জীবন দারিদ্রতার বিরুদ্ধে কস্টকরে জীবন যাপন করে যখন একটু ভাল অবস্থা আসতে শুরু হয়েছে তখন তিনি ইন্তাকাল করেন।
উনার এক মেয়ে দিয়েছেন অনেক আগেই। আরেক ছেলে মনির, তেমন লেখাপড়া জানেনা, বিভিন্ন ধরনের কাজ করে চলার চেস্টা করে। মনিরের ২ ছেলে অন্তর, আসিফ- ওরাও বড় হয়েছে, লেখাপড়া ওরাও তেমন করেনি। বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে।

এদের বাড়িতে যে পরিবর্তন বর্তমানে দেখা যায় এর পিছনে কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এর যথেষ্ট ভুমিকা ছিল। মরহুম মোঃ মোছলেম একজন সৎ মানুষ ছিলেন, নিজের ভাগ্যউন্নয়নের জন্য সৎভাবে সারা জীবন চেস্টা করে গেছেন। উনার স্ত্রীও বর্তমানে জীবিত নেই, তিনিও অনেক কস্ট করেছেন।

## মরহুম মোঃ কুকিল্লা

(মোঃ হায়াত আলী, মোঃ ছোহরাব আলী)

মরহুম মোঃ কুকিল্লা বয়স্ক মানুষ ছিলেন। দেখতে হালকা-পাতলা ছিলেন, মুটামুটি লম্বা ছিলেন, মুখে দাঁড়ি ছিল। উনার কিছু নিজস্ব জমিজমা ছিল, তবে সঠিকভাবে চাষ না করাতে পারায় আর্থিকভাবে তেমন স্বচ্ছল ছিলেননা।

নিজের ছেলে-মেয়েরা সবাই বিবাহিত ছিলেন। ছেলেদের মধ্যে বড় ছেলে হায়াত আলী, কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এখনও বড় ছেলে জীবিত আছেন। শহীদ ও জাহিদ নামে ২ ছেলে ও ১ মেয়ে।

মরহুম মোঃ কুকিলা তেমন পড়ালেখা জানতেননা তবে সকল বিষয়ে খুব সচেতন ছিলেন। উনার বড় ছেলে মোঃ হায়াত আলী কিছুটা লেখাপড়া জানতেন এবং বিচক্ষন লোক ছিলেন। পরবর্তি প্রজন্ম লেখাপড়া শিখে অনেক সংসারে উন্নতি করেছেন, যেমন উনার ছোট ছেলে জাহিদ মাস্টার্স পাস করে বেসরকারি ভাল জব করছেন।

মরহুম মোঃ কুকিল্লা এর ছোট ছেলে সোহরাব আলীও প্রচুর পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। নিজ পরিশ্রমে বর্তমানে ভাল অবস্থায় আছেন। সোহরাব আলীর এক ছেলে ২ মেয়ে নিয়ে সংসার।

পেশা হিসাবে মুলত কৃষিকাজ ছিল, তবে বর্তমানে এর পাশাপাশি নালী বাজারে দোকান রয়েছে।

মরহুম মোঃ কুকিলার গ্রামের মধ্যে ২ টি বাড়ি ছিল। একবাড়িতে বড় ছেলে অন্য বাড়িতে ছোট ছেলে বসবাস করে।

উনাদের কৃষি জমি থাকলেও সঠিকচাষের অভাবে ঠিকমত লাভবান হতে পারতেননা। তাই অভাব অনটন প্রচুর ছিল একসময়।

বর্তমানে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। মরহুম মোঃ কুকিলা নিজে সে অবস্থা তেমন দেখে যেতে পারেননি।

উনার বাড়িতেও শনের পাতার ঘর ছিল। তবে গরু বাছুর অনেক আগে থেকেই পালন করতেন। মুলত কৃষিকাজে এসব গরু ব্যবহার করা হত।

উনারা গরু পালন করতেন বিভিন্ন প্রয়োজনে যেমন ক্ষেত চাষ, দুধ বিক্রয় ইত্যাদি।

উনার ছেলে সোহরাব হোসেন যে বাড়িতে থাকে এই বাড়ি একসময় ঘন জংগলে ভরা ছিল, কেউ বাস করতনা। এখন এই বাড়িতে সুন্দর পরিবেশ হয়েছে, পাকা ঘর, টিনের চাল ইত্যাদি।

এই বাড়িটি মরহুম মোছলেম এর বাড়ির উত্তর দিকে অবস্থিত। প্রচুর সুপারি, আম, নারিকেল গাছ আছে এই বাড়িতে। এছাড়া বিখ্যাত তাল গাছ রয়েছে, গরমের দিনে এই তাল গাছের রস খাওয়ার জন্য একসময় মানুষের ভীড় লেগে যেত।

মরহুম মোঃ কুকিলা এবং তাঁর সন্তানেরা বর্তমানে ভাল আছেন, উনাদেরকেও আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছিলেন কাজি আব্দুল খালেক (রতন) কখনও গরু কিনে দিয়ে বা টিন কিনে দিয়ে।

## মরহুম শেখ ঘটু ( নুরুল ইসলাম)

মরহুম মোঃ শেখ ঘটু এর বাড়ি মোঃ সোহরাব আলির বাড়ির উত্তর দিকে। বাড়ি তেমন বড় না হলেও চকে বাড়ির আশে পাশে কিছু কৃষি জমি ছিল তাঁর।

কৃষি কাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করতেন, লেখাপড়া তেমন জানতেননা। ফলে নিজের ছেলে-মেয়েদেরকেও লেখাপড়া শেখাননি।

মুখে খোচা খোচা দাঁড়ি, হালকা ফর্সা, পাতলা গড়নের মানুষ ছিলেন শেখ ঘটু। শেখ ঘটু নামে পরিচিত ছিল কারন গ্রামে একজন হিন্দু লোক ছিল তাঁর নামও ঘটু সাহা ছিল। মৃত ঘটু সাহা হলেন কৃষ্ণ সাহা এর বাবা।

শেখ ঘটুর পেশার মধ্যে কৃষিকাজ ছিল প্রধান। বাড়ির আশে পাশে নিজের জমিতে বিভিন্ন ফসলের চাষ করতো যেমন আখের চাষ, আলুর চাষ ইত্যাদি। আখের চাষ করে নিজে বর্ষার পানিতে পরিস্কার করে কেটে টুকরা টুকরা করে নালী বাজারে নিয়ে বা আরো দূরে নিয়ে বিক্রি করতেন।

এসব লোকের জমিজমা থাকা সত্বেও সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে নিজে তেমন লাভবান হতে পারতেন। ফলে ভাল খাবার এবং ভাল পোশাক ও বাসস্থান থেকে বঞ্চিত ছিল।

এসব কিছুর পিছনে স্কুলের শিক্ষার অভাব ছিল। অর্থাৎ পড়াশুনা না জানার কারনে সবকিছু থাকার পরেও সারাক্ষণ অভাব অনটনে থাকতে হত।

সম্পদ মহান আল্লাহ দিয়েছেন নিজেদের অভাব অনটন দূর করে ভাল থাকার জন্য, কিন্তু এসব মানুষ নিজে কস্ট করে সম্পদ ধরে রাখার চেস্টা করেছেন। ফলে ভাল খাবার, ভালো বাসস্থানে তারা থাকতে পারেননি।

এছাড়া তৎকালীন সময়ে কৃষিকাজ অনেক কস্ট সাধ্যছিল। যেমন একই জমিতে ফসল চাষের জন্য কয়েকবার চাষ করে জমিকে ফসল ফলানোর উপযোগী করে গড়ে তুলতে হত। এতে অনেক সময় লেগে যেত। একই জমি থেকে বছরে এক বারের বেশি ফসল পাওয়া যেতনা।

লাঙ্গল দিয়ে গরু দ্বারা টেনে জমিনকে চাষের উপযোগী করতে হত। এসব কাজে প্রচুর পরিশ্রম ও সময় লাগতো।

কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এসব লোকের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাদেরকে বিনা সুদের জমিচাষের জন্য মূলধন দিয়েছিলেন সহজ শর্তে। এছাড়া টিন দিয়েছিলেন ভাল বাসস্থানের জন্য, পাশাপাশি নগদ অর্থ আয়ের জন্য গরুর ব্যবস্থা।

মরহুম শেখ ঘটুর জমিজমা কিছু থাকা সত্বেও অভাব অনটনে দিন কাটাতেন। তবে সারাক্ষণ মুখে হাসি আর বিউটি বিড়ি চলতো। কখনও একেবারে হতাশ হননি, কস্ট করেছেন প্রচুর।




(২০১০ সালে একটি ইন্টারভিউতে তিনি তাঁর আনন্দের কথা ব্যক্ত করেন। একসময় তাঁর অনেক কস্ট ছিল এখান থেকে সুদমুক্তি ঋন পাওয়াতে তিনি এখন অনেক ভাল আছেন। এরকিছু দিন পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন।)

এসব মানুষের সংখ্যা এখন দিন দিন কমে আসছে। এত অভাব আর তেমন কারো ঘরে নেই। তাঁর ছেলেরা যদিও কিছুটা সচেতন, তাই বিভিন্ন সমস্যা কমে গেছে। তিনি ৫/৬ বছর আগে ইন্তেকাল করেছেন।

মরহুম শেখ বিনাত আলী

(ফরহাদ, আব্দুল আলিম, ওলী)

গোহাইলবাড়ি গ্রামের মধ্যে কথাবার্তায় আমাদের দেখা সবচাইতে বিনয়ী ও নরম মানুষ ছিলেন মরহুম শেখ বিনাত আলী।




(মরহুম শেখ বিনাত আলীর বাড়ি। মরহুম বিনাত আলীর বাড়িতে বর্তমানে তাঁর তিন ছেলে বসবাস করেন।)

মরহুম শেখ বিনাত আলী বয়স্ক মানুষদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনিও কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তবে নিজের জমিজমা তেমন ছিলনা, অন্যের জমিতে চাষ করে চলতেন। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের কাজ করে চলতেন।

মরহুম শেখ বিনাত আলী খুব কস্টে জীবন যাপন করতেন। উনার ছেলেরা তখনও তেমন আয়রোজগার করতে পারতেননা। ছেলেরা প্রায় সবাই লেখাপড়া জানতেননা, বড় ছেলে কিছু লেখাপড়া জানতেন বলে মনে হয় তাও উল্লেখ করার মতন না।

উনার ছেলেরা আরিচা ঘাটে বিভিন্ন ফলমূল বিক্রয় করতেন। গোহাইলবাড়ি, নালী, গোয়ালখালির আশে পাশে থেকে পেঁপে, পেয়ার, আখ ইত্যাদি কিনে নিয়ে আরিচা ঘাটে বিক্রয় করতেন।

আরিচা ঘাট তখন (১৯৯০/ ৯৫ সাল) ব্যবসার জন্য খুব বিখ্যাত ছিল। প্রচুর গাড়ি সেইসময় আরিচা ঘাট হয়ে উত্তর বঙ্গে ও দক্ষিন বঙ্গে যেত। যেমন আরিচা থেকে তখন নগরবাড়ি হয়ে উত্তর বঙ্গে এবং দৌলতদিয়া দিয়ে দক্ষিন বঙ্গে যাওয়ার রাস্তা ছিল।

এই ব্যবসায়িক কাজে ছেলেদের পর্যাপ্ত মূলধন ছিলনা। কাজি আব্দুল খালেক (রতন) উনার অনুরোধ ছেলেদেরকে মূলধন দেন ব্যবসা করার জন্য সহজ শর্তে।

এছাড়া ঘর তোলার জন্য টিন দিয়েছিলেন।




(২০১০ সালে তোলা এই ছবিতে চোখে চশমা পড়া খালি গায়ে বসে আছেন মরহুম শেখ বিনাত আলী। এই বাড়ি মরহুম শেখ ঘটু এর। এই বাড়ির পশ্চিমে মরহুম শেখ বিনাত এর বাড়ি।)

মরহুম শেখ বিনাত আলীর মুখে দাড়ি ছিল, নামাজ পড়তেন বলে মনে হত। যদিও গ্রামে তখন মসজিদ ছিলনা, নালি বাজারে অথবা সয়দাবাদ মসজিদে কেউ কেউ নামাজ পড়তেন।

ঈদের নামাজ আমরা প্রায় সবাইকেই পড়তে দেখতাম সয়দাবাদ বাদ মসজিদ প্রাঙ্গনের ঈদগা মাঠে।

নালী বাজারে হাটের দিন তিনি বাজার করতে যেতেন। পথে ঘাটে আমাদের সাথে দেখা হলে খুব ভদ্রভাবে ছালাম দিয়ে কথা বলতেন।

কখনও কারো সাথে তর্ক করা বা রেগে কথা বলা উনার স্বভাবে ছিল বলে আমাদের চোখে পরেনি।

সংসারে অভাব অনটন থাকলেও কখন হা-হুতাশ করতেন না। সবর করতেন, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করতেন, যা আছে তাতেই খুশি থাকতেন।

খুব শোকর গুজার বান্দা ছিলেন উনি। উনার সন্তানদের মধ্যেও এসব নম্রতার স্বভাব দেখা যায়।

মরহুম আকবর আলী (আব্দুল মজিদ, আহাম্মদ আলী)

মরহুম আকবার আলী খুব হাসি খুশি মানুষ ছিলেন। গ্রামে যাদের জমিজমা ছিল তিনি তাদের মধ্যে একজন।

তিনি দেখতে ফর্সা, মাঝারি গড়নের এবং কিছুটা কম উচ্চতার মানুষ ছিলেন। জীবনের শেষ দিকে এসে মুখে দাঁড়ি রেখেছিলেন। লুঙ্গী, গেঞ্জি, ফতুয়া, পাঞ্জাবি পড়তেন। সবার সাথে মিলে মিশে চলতেন।

যেহেতু বেশ কিছু জমিজমা ছিল এবং কৃষিকাজ উনি ভাল বুঝতেন, ফলে উনার আর্থিক সমস্যা তেমন ছিলনা।

উনার ছেলে-মেয়েদের উনি নিজে বিয়ে করিয়েছেন অনেক আগেই। ২ ছেলে ও কয়েকজন মেয়ে ছিল। তবে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া তেমন শিখাননাই। নিজেও লেখাপড়া জানতেন না, তবে খুব সচেতন মানুষ ছিলেন। নিজের জীবনের শেষ সময়ে এসে উনি আর্থিক সমস্যায় পড়েন, সঠিক কি কারনে সমস্যা হয়েছিল আমরা জানিনা।

তবে উনি এবং উনার স্ত্রী দীর্ঘদিন অসুস্থাবস্থায় ছিলেন। ভাল চিকিৎসা হয়েছিল কিনা জানা নেই।

উনার ইন্তেকালের পরে ২ ছেলে মুজিবর এবং আহাম্মদ আলী এখন ঐ বাড়িতে বসবাস করছেন।

পুর্বের মতন জৌলুস এখন আর এই বাড়িতে তেমন নেই। বড় ছেলে মজিবর নালী বাজারে চায়ের দোকান করে আর ছোট ছেলে আহাম্মদ আলী দুর্ঘটনায় মারাত্বক অসুস্থ হয়ে কোনরকম জীবন যাপন করছেন।

এই বাড়িতে একসময় অনেক আনন্দ ছিল, কারন উনার মা অনেক ভাল মানুষ ছিলেন। মানুষের পাশে সুখে দুখে দাড়ানোর চেস্টা করতেন। সবাইকে অনেক আদর ও সম্মান করতেন।

এই বাড়িতে একসময় অনেক গাছ পালা ছিল। বর্তমানে কিছু গাছ রয়েছে। গাছ গাছালির মধ্যে সবচাইতে বেশি হল বাঁশ গাছ, এছাড়া সুপারি গাছও রয়েছে।

এই বাড়ির দক্ষিনে গ্রামের মধ্যেকার একমাত্র হিন্দু বাড়ি অর্থাৎ অমলেশ (মৃত ঘটু সাহা এর ছেলে) দের বাড়ি। উত্তরে বিরাট বাঁশ ঝাড় ও চক। পশ্চিমে তাঁর ভাই মরহুম হোসেন আলির বাড়ি।

এই বাড়ির হারানো সৌন্দর্য্য আবারও ফিরে আসবে আশা করি।

এই বাড়িতেও অন্যান্য বাড়ির লোকদের মতন সাহায্য করেছিলেন কাজি আব্দুল খালেক (রতন)। এখনও সবার খোজ খবর রাখেন তিনি। মরহুম আকবার আলীর ছোট ছেলের দূর্ঘটনার খবর শুনে আর্থিকভাবে সাহায্য করেছিলেন তিনি।

এই বাড়িতে একসময় অনেক বড় ঘর ছিল, গোয়ালে ভরা গরু ছিল, ঘর ভর্তি ফসল ছিল। এখন কিছুটা ভাটা পড়েছে, আবারও সেই দিন ফিরে আসবে বিলে আমরা মহান আল্লাহর কাছে আশা করি।

আহাম্মদ আলী অবশ্য বাড়িতে পাকা করে ঘর দিয়েছে, ছেলেদেরকে পড়াশুনা করানোর চেস্টা করছে। এতে বুঝা যায় খুব তারাতারি তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে ইনশাআল্লাহ।

মরহুম মোঃ আকবার আলীর ছেলে আহাম্মদ আলী বছর ২ আগে রোডে এক্সিডেন্ট করে হাত পায়ে বিরাট আঘাত পেয়েছিল।

বর্তমানে একপা প্রায় বিকল থাকাতে নিজের পায়ে হাটতে পারেননা। তাঁর অবস্থা শুনে কাজি আব্দুল খালেক (রতন) আর্থিকভাবে হেল্প করেন। বাজার করে দেন যাতে কিছু দিন চলতে পারেন।

পরে যখন জানতে পারলেন সে আসলে এখন আর্থিকভাবে অনেক সমস্যায় আছে। তখন তিনি তাকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য নালী বাজারে ব্যবসা করার পরামর্শ দেন।

শুধু পরামর্শ নয় ব্যবসা করার জন্য যাকিছু প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করেন। নালী বাজারে আহাম্মদ আলী বর্তমানে (২০২৪) চায়ের দোকান করেন। বড় ছেলে নাইম তাকে হেল্প করেন।

চায়ের দোকানের জন্য সুদবীহিন ঋন জনাব  কাজি আব্দুল খালেক (রতন) দেন যাতে সে সহজে স্বাবলম্বী হতে পারে।



(আহাম্মদ আলী, নালী বাজার)

আহাম্মদ আলী নিজে জানান, “আমার ২ বছর আগে এক্সিডেন্ট হয়েছিল, হাটতে পারিনা, ক্রেচে ভর দিয়ে হাটতে হয়। কাজি সাহেব যখন জানতে পারেন তখন আমাকে বলেন, ৫ বা ১০ হাজার টাকা তোমাকে দিলে কিছুদিন পরে এই টাকা শেষ হয়ে যাবে। এর চাইতে যদি ব্যবসা করি, তাহলে স্বাবলম্বী হতে পারবো, সমস্যার সমাধান হবে। এরপরে উনি নিজেই ব্যবসা করার পরামর্শ দেন। ব্যবসার জন্য পুঁজি দেন। গ্রামের শফি, জিলমদ্দিন এরাই আমার সম্পর্কে উনার কাছে বলেছিল। গ্রামের শফি, জুমাত মেম্বারসহ অনেককেই উনি আমার খোঁজ খবর নিতে বলেছেন। উনি নিজেও আমার খোঁজ খবর নেন।”

মরহুম মোঃ মনছের আলী

(লুতফুর রহমান, ইমতিয়াজ)

গোহাইলবাড়ি গ্রামের মধ্যে শারীরিকভাবে পরিশ্রমী ৫ জন মানুষের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মরহুম মোঃ মনছের আলী তিনি একজন সৎ ও পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন।

মরহুম মোঃ মনছের আলী বিভিন্ন ধরনের পরিশ্রমী কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি কৃষিকাজ থেকে শুরু করে মাটি কাটা পর্যন্ত প্রায় সব ধরনের কাজ করতেন। ছোট ঘরে বসবাস করতেন। গরু পালন করতেন। আখের পাতা ও ছনের ছাউনি দিয়ে ঘর তুলে থাকতেন।

উনি একজন সহজ ও সরল মানুষ ছিলেন। লেখাপড়া জানতেননা। রেগে গেলে জোরে জোরে কথা বলতেন। সৎ ও সাহসী ছিলেন, বড়দেরকে সম্মান করতেন, ছোট আদর করতেন। সারা জীবন অভাবের সাথে লড়াই করেছেন।

উনার ঘরের উত্তর পাশে ছিল আবু পাগলের ঘর এবং দক্ষিন পাশে সারি বেধে ছামছের আলী ও তাঁর আরেক ভাই আনছের আলীর ঘর ছিল। ছোট ছোট আখ বা ছনের বেড়া দিয়ে তৌরি ঘর ছিল।

বর্তমানে অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। এখন এই বাড়িতে পাকা ও টিনের বড় ঘর রয়েছে।

মরহুম মোঃ মনছের আলীর অভাব অনটনের সংসারে সাহায্য করে পাশে দাঁড়িয়েছিলে কাজি আব্দুল খালেক (রতন)।

তিনি তাকে গরু কিনেদিয়েছিলেন। গরু সম্পর্কে মনছের আলীর বক্তব্য ছিল এরকম, এই গরুর ঘাস নিয়ে কেটে খাওয়াতেন আর গরুর দুধ বিক্রি করে নিজের সংসারে নগদ টাকা আসতো। এই নগদ টাকা দ্বারা কিছু সংসারে খরচ করতেন আর বাকিটা জমিয়ে গরুর দাম বাবদ নেওয়া টাকা সহজ কিস্তিতে পরিশোধ করতেন। যেহেতু কোন সুদ দিতে হতনা ফলে খুব সহজে ঋন শোধ হত এবং কয়েক বছরের মধ্যে গরু আরো বড় হয়ে যেত। গরু বড় হলে বিক্রি করে নতুন আরেকটা ছোট গরু কিনা যেত যা দিয়ে আবার শুরু হত। এভাবে নিজে গরুর মালিক হয়ে যাওয়া যেত।




(২০১০ সালে তোলা ছবিতে ছামছের আলী, মরহুম মনছের আলী ও মরহুম আব্বাস আলীর ঘর।)

এছাড়া কাজি আব্দুল খালেক (রতন) ঘরের জন্য টিন দিয়েছিলেন। এই টিন দিয়ে ঘরে চালের ব্যবস্থা করেন।




(২০১০ সালের এক ছবিতে মরহুম মোঃ মনছের আলী, উনি এখান থেকে লোন নিয়ে গরু কিনে সুদমুক্ত শর্তে ঋন শোধ করে লাভবান হয়েছিলেন সেই কথা জানাচ্ছেন।)

বর্তমানে মরহুম মোঃ মোনছের আলির ছেলে লুতফর রহমান তাঁর বাড়িতে বসবাস করেন। আগের চেয়ে অবস্থা অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

আর্থিক সমস্যা তেমন নেই বললেই চলে, তবে এই পরিবর্তন মরহুম মোঃ মনছের আলী দেখে যেতে পারেননি।

মরহুম মোঃ মনছের আলী শত কস্টের মধ্যেও হাসি খুশি থাকতেন, সব সময় নিজেকে কাজে ব্যস্ত রাখার চেস্টা করতেন।

মরহুম আনছের আলী

(বিল্লাল)

মরহুম মোঃ আনছের আলী একজন সহজ সরল মানুষ ছিলেন। প্রচুর পরিশ্রম করতে পারতেন। তৎকালীন সময়ে মাটি কাটা থেকে শুরু করে সব ধরনের শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতেন। মুখে দাঁড়ি ছিল, লুঙ্গি, গেঞ্জি পড়তেন।

উনার অনেক বড় পরিবার ছিল। ৪/৫ জন মেয়ে ১ ছেলে নিয়ে সংসার। উনি নিজে লেখাপড়া জানতেন, সন্তানাদিও তেমন লেখা পড়া জানতোনা। তবে উনি খুব সৎ জীবন যাপনের চেস্টা করতেন।

মরহুম মোনছের আলীর ঘর তাঁর আরেক ভাই ছামছের আলীর সাথে লাগান ছিল। ছোট ছোট ঘরে উনারা বাস করতেন। বেশির ভাগ ঘর বাঁশের চটা দিয়ে বানান ছিল।

কাজি আব্দুল খালেক (রতন) উনাকে ঘর তোলার জন্য টিন দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন সময় আর্থিকভাবে সাহায্য করেছিলেন।




(এই ধরনের বাঁশের চটা দিয়ে তোলা ঘরে তিনি থাকতেন।)

বর্তমানে (২০২৪) তাঁর ছেলে বিল্লাল হোসেন এই বাড়িতে বাস করেন। আর্থিক অবস্থা পুর্বের চাইতে কিছুটা ভাল।

মরহুম মোঃ চুন্নু মোল্লা

(সেলিম মোল্লা, শামিম মোল্লা, আল-আমিন মোল্লা)

মরহুম মোঃ চুন্নু মোল্লা গোহাইলবাড়ি গ্রামের মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন একজন মানুষ ছিলেন। তিনি ঐ সময়ে গ্রামের মানুষকে কিছুটা ইসলামের দিকে আহবান করার চেস্টা করেছিলেন। নিজে কিছুটা সুফী চিন্তা ধারার ছিলেন।



(বর্তমানে ২০২৫ সালে এই বাড়িতে মরহুম মোঃ চুন্নু মোল্লার ৩ ছেলে বসবাস করেন। মোঃ সেলিম মোল্লা, মোঃ শামিম মোল্লা ও মোঃ আল-আমিন মোল্লা। সেলিম মোল্লার ২ ছেলে নাইম ও আমির হামজা ওরফে নাহিন মোল্লা এবং ১ মেয়ে লামিয়া আক্তার বসবাস করেন। এছাড়া মোঃ শামিম মোল্লার ২ মেয়ে আফছানা ও ছায়মা, ১ ছেলে ইমাম রাব্বানি এই বাড়ির বর্তমান উত্তরাধিকারী)

মরহুম মোঃ চুন্নু মোল্লা লঞ্চে চাকুরি করতেন, পাশাপাশি ইসলামি বই পস্তক পড়তেন এবং ইসলামিক ব্যক্তিত্বদের সাথে উঠাবসা করতেন।

নামাজ পড়তেন, পরিস্কার পরিচ্ছন থাকতেন, মুখে মাঝে মাঝে চাপ দাঁড়ি দেখা যেত। পায়জামা, পাঞ্জাবি, শার্ট্ম লুঙ্গি পড়তেন। ফর্সা, লম্বা, মধ্যম গড়নের মানুষ ছিলেন।

আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল না হলেও হা-হুতাশ করতেননা, কারো কাছে সহজে কিছু চাইতেননা।

সন্তানাদিকে লেখা পড়া করানোর চেস্টা করেছিলেন, নিজেও কিছুটা শিক্ষিত ছিলেন।

কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এই পরিবারে সাহায্য করেছিলেন। ঘর তোলার জন্য টিন এবং উনার সন্তানের পড়ালেখার জন্য সহযোগিতা করেছিলেন।

উনি এবং উনার স্ত্রী কেউ বেঁচে নেই। যতদিন বেঁচে ছিলেন দারিদ্রতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে।

বর্তমানে তাদের অবস্থা কিছুটা ভাল। তিন ছেলের মধ্যে বড় জন বর্তমানে (২০২৪) নালী বাজারে ব্যবসা করেন, মেঝ জন এবং ছোটজন ঢাকায় চাকুরি করেন।

দারিদ্রতা এই পরিবারের নিত্য সঙ্গী ছিল তবে সততা আদর্শে তাদের কোন ঘাটতি ছিলনা।

মরহুম মোঃ বাবর আলী

(ফজল, বারেক, রেজ্জাক)

মরহুম মোঃ বাবর আলী গ্রামের মধ্যে কম কথা বলা এবং সৎ লোকদের মধ্যে একজন। উনি খুব সহজ সরল ও অনারম্বর জীবন যাপন করতেন। প্রচুর পরিশ্রমী ছিলেন। সব ধরনের শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতেন। উনি বেশির ভাগ কৃষি কাজ করতেন। তবে উনাকে আমরা সবচাইতে বেশি দেখেছি গরু পালন করতে। উনার বাড়িতে প্রায় সময় গরু থাকতো। নিজে ঘাস কেটে গরুকে খাওয়াতেন।

দারিদ্রতা থাকলেও খুব সৎ জীবন যাপন করতেন। ধর্ম কর্ম তেমন করতে দেখি নাই। তিনি লুঙ্গি গেঞ্জি পড়তেন। মরহুম মোঃ বাবর আলীর সন্তানদের মধ্যে ফজল বর্তমানে ঢাকার ভাল চাকুরি করে, পাশাপাশি নিজ গ্রামে পোল্ট্রি মুরগীর ব্যবসা করে। এছাড়া নিজের বাড়িতে গরুর ফার্ম রয়েছে। অন্যান্য সন্তানের মধ্যে বারেক আলী গ্রামে বিভিন্ন কৃষিকাজ করে, গরু পালন করে। আরেক ভাই ব্যবসা করে।



(মরহুম মোঃ বাবর আলীর ছোট ছেলে মোঃ সজল খান (ফজল) এর ঘর, তিনি তাঁর ছেলে তুহিন ও মেয়ে তুলিকে নিয়ে এই বাড়িতে বসবাস করেন। এই পরিবারে এখন আর আর্থিক সমস্যা নেই বললেই চলে। কাজি আব্দুল খালেক রতন উনাদেরকে ঘরের জন্য টিন দিয়েছিলেন যা তাঁর সন্তানেরা আজও মনে রেখেছে।)

মরহুম মোঃ লোকমান আলী

(জুলুমুদ্দীন, জিলমদ্দিন)

মরহুম মোঃ লোকমান আলী এই গ্রামের আমাদের দেখা বয়স্ক মানুষের মধ্যে একজন। উনি ফর্সা, একটু কম উচ্চতা সম্পন্ন একজন মানুষ ছিলেন। নালী বাজারে কাচা মালের ব্যবসা করতেন।

উনার আর্থিক অবস্থা মুটামুটি ভালই ছিল। কারন উনি ব্যবসার কাজটা খুব ভালভাবে করার চেস্টা করতেন। পরবর্তী সময়ে উনার দুই ছেলের মধ্যে জুলুমদ্দিন এই কাচা মালের ব্যবসা এখনও করতেন।

তবে দারিদ্রতা থেকে তেমন মুক্তি মেলেনি। নিজের জিবদশ্যাতেই তিনি নিজের ছেলেদের আর্থিক দুরাবস্থা দেখেছেন। এখনও তাঁর ছেলেদের মধ্যে দারিদ্রতা কিছুটা আছে। তবে আগের সেই ভয়াবহ অবস্থা এখন নেই।




(মরহুম মোঃ লোকমান হোসেন এর বাড়ি।)

মরহুম মোঃ লোকমান হোসেন এর বাড়িতে বর্তমানে তাঁর ২ ছেলে বাস করেন। বড় ছেলের ঘরের নাতি ইছাক, রাজিব, আসলাম এই বাড়িতে বাস করেন। ছোট ছেলের ঘরের নাতি রাকিব এবং তাঁর ছেলে রাফি এই বাড়িতে বাস করছেন।

মরহুম মোঃ আবু পাগল

(আক্কাছ আলী, আলতাফ হোসেন, ছিদ্দিক আলী)

মরহুম মোঃ আবু পাগল নিজেকে মারফতি তরিকার সুফি সাধক মনে করতেন। নিজের কিছু ভক্তও ছিল। বর্তমানেও তাঁর ভক্তরা তাকে স্মরন করেন। মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে গান-বাজনা ও শরিয়াত মারফতের বিতর্ক বসে। দাড়ি গোফ কিছুই ছিলনা, টুকরা করা কাপড় দিয়ে জামা বানিয়ে পড়তেন, লুঙ্গী পড়তেন। হাতে একটা ছড়ি থাকতো সব সময়।

তাঁর ছেলে মেয়ের মধ্যে ১ মেয়ে ব্যতিত সবাই গ্রামের বাইরে অন্য গ্রামে বিয়ে হয়েছে। ছেলেরা সবাই তার বাড়িতে বসবাস করে।

ছেলেদের মধ্যে আক্কাছ আলী, আলতাফ আলী, ছিদ্দিক আলী- সবাই প্রায় কৃষিকাজের সাথে জড়িত। তবে এর পাশাপাশি আলতাফ আলী ভ্যান চালান এবং ছিদ্দিক আলী কাচা মালের ব্যবসার সাথে তারা জড়িত।




(এই বাড়িতে বর্তমানে মরহুম আবু পাগলের ৩ ছেলে বসবাস করেন।)

মরহুম মোঃ আব্বাস আলী

(লতিফ, রনি)

মরহুম মোঃ আব্বাস আলী একজন সৎ ও পরিশ্রমী লোক ছিলেন। তিনি এই গ্রামের সন্তান ছিলেননা অর্থাৎ উনার পিতামাতা এই গ্রামের মানুষ নয়। তিনি এই গ্রামের মরহুম মোঃ মোনছের আলির মেয়েকে বিয়ে করে এই গ্রামেই বসবাস করতেন। উনার জন্মস্থান সম্ভবত ঘিওর এলাকায়। উনার বাবা মা ঐ এলাকাতেই বসবাস করেন। এই গ্রামের মেয়ে বিয়ে করে এই গ্রামেই তিনি নিজের আবাসস্থল বানান। তিনি প্রচুর পরিশ্রম করতেন। সব ধরনের শারিরীক পরিশ্রমের কাজ করতেন। মাটিকাটা, মাছ ধরা, ফলমূল বিক্রিকরাসহ যখন যে কাজ করার দরকার উনি করতেন।

তাঁর সন্তানদের তিনি খুব ভালবাসতেন। নিজের যোগ্যতার মধ্যে যতটুক সম্ভব নিজের স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে ভাল থাকার চেস্টা করতেন।



( ২০১০ সালে তোলা ছবি, মরহুম মোঃ মনছের আলীর বাড়িতেই আলাদা এরকম ঘর বানিয়ে মরহুম মোঃ আব্বাস আলী তাঁর স্ত্রী ও সন্তানসহ থাকতেন। )

উনার ৩ ছেলের মধ্যে আব্দুল লতিফ বর্তমানে নালী বাজারে ছাইকেল মেরামতের কাজ করে। আরেকজনও তাকে হেল্প করে, নিজেরা গোহাইলবাড়ি গ্রামের পাশে নালির  রাস্তার সাথে নিজস্ব বাড়ি ঘর বানিয়েছে। আগের সেই আর্থিক খারাপ অবস্থা নেই, কিন্তু শুধু মরহুম মোঃ আব্বাস আলী নেই।

মরহুম মোঃ আখতাঁর মোল্লা

(ফজলুল হক এর পিতা এবং জসিম এর নানা)

মরহুম মোঃ আখতার আলী এই গ্রামের একজন সৎ মুসলিম ব্যক্তিত্ব। তিনি আর্থিকভাবে অনেক কস্টে দিনাতিপাত করলেও ইসলামি আকিদার ব্যাপারে, নামাজ আদায়ের ব্যাপারে খুব সচেতন ছিলেন।

নিয়মিত নামাজ আদায়কারী ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

উনার মুখে দাঁড়ি ছিল, মাঝারী গরনের শ্যামলা বর্নের মানুষ ছিলেন। গোহাইলবাড়ি গ্রাম থেকে নালী বাজার মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায়কারী নিয়মিত ছিলেন তিনি। ইসলামী আদর্শের সামনে তিনি ভিন্ন কোণ মতাদর্শ যা ইসলামের মূল চিন্তা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যায় তাদের সাথে কখনও ভয় পেয়ে আপোস করেননি। মনে প্রানে চাইতেন ইসলামি আদর্শ প্রতিষ্ঠা হোক যদিও উনি দারিদ্রতার সাথে সব সময় লড়াই করতেন। কৃষি কাজ, দিনমজুর হিসাবে কাজ ইত্যাদি করে তিনি চলতেন।



(মরহুম মোঃ আখতার মোল্লার ছেলে মোঃ ফজলুল হক বর্তমানে এই বাড়িতে বসবাস করেন।)

রহুম মোঃ রহিজ উদ্দিন (নইজে ডাক্তার)

(মোঃ বাবলু, মোঃ জিন্নাহ)

গোহাইলবাড়ি গ্রামে আরেকজন আধ্যাতিক সাধনার ব্যক্তি ছিলেন মরহুম মোঃ রহিজ উদ্দিন (নইজে ডাক্তার)। তিনি কালো পোশাক পড়তেন, মুখে দাঁড়ি ছিল, হাতে সবসময় একটা ছড়ি থাকতো।

উনি নিজেকে ঝিটকার বিখ্যাত সুফি সাধক লোকমান হেকিমের (রঃ) শিষ্য দাবি করতেন। উনি মাঝে মাঝে নামাজ পড়তেন। গানবাজনা কিছুটা পছন্দ করলেও এরপক্ষে তেমন কট্টড় ছিলেননা।

জীবনের মাঝামাঝি পর্যায় থেকেই নিজে বাড়ি ছেড়ে রাস্তার সাথে নিজস্ব আইডিয়া মোতাবেক বিশেষ ঘর তুলে খুব নিরিবিলি থাকার চেস্টা করতেন।

উনার ছেলেদের মধ্যে মোঃ বাবলু, মোঃ জিন্নাহ এখনও উনার বাড়িতে থাকেন। মোঃ বাবলু নালী বাজারে ব্যবসা করেন। মোঃ জিন্নাহ বিদেশে ছিলেন বেশ কিছু দিন, এরপরে বর্তমানে বাড়িতে থাকেন।

উনার আর্থিক অবস্থা অনেক ভাল ছিল। চকে জমিজমাসহ অনেক সম্পদ ছিল। বাড়ি-ঘর সব তৎকালীন সময়ের খুব উন্নত ছিল। উনাদের বাড়িতে ঐ সময় টিভি ছিল। গ্রামের মধ্যে ২ টি বাড়িতে টিভি ছিল। বাবুল সাহা এর বাড়ি এবং উনাদের বাড়ি।

এছাড়াও উনার ছেলে মোঃ বাবলু মোটর সাইকেল নিয়ে চলাফেরা করতেন। এটাও ব্যতিক্রম ছিল। কারন গ্রামের মধ্যে ২ টি বাড়িতে মোটর সাইকেল ছিল, আরেকটি হল বাবুল সাহাদের বাড়ি।

একসময় উনাদের বাড়তে অনেক লোক কাজ করতো, যেহেতু প্রচুর জমিজমা ছিল। বর্তমানেও অবস্থা ভাল। এই বাড়ির পাশে আরো কয়েকটি বাড়ি ছিল যাদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল যেমন মরহুম মোঃ রহমত আলী ও তাঁর ভাইদের অনেক জমিজমা ছিল। এছাড়া গ্রামের অধিকাংশ মানুষের অবস্থা তেমন ভাল ছিলনা।

গ্রামের কয়েকজন মানুষের পরিচয় আমরা তুলে ধরলাম যাতে গ্রামের মানুষ সম্পর্কে একটি ধারনা সৃষ্টি হয়। তাদের আর্থিক অবস্থা, ঘর, পেশা, চিন্তা ভাবনা ইত্যাদি। নতুন প্রজন্ম যেন জানতে পারে তাদের পূর্ব পুরুষেরা কেমন ছিল, পাশাপাশি কাজি আব্দুল খালেক (রতন) তাদের পাশে ছিলেন, যতটুক সম্ভব সাহায্য করেছেন যাতে দারিদ্রতা দূর হয়, সবাই কিছুটা স্বাবলম্বী হয়, শান্তি পায়।

৩। তৎকালীন সময়ে **(**১৯৯০/৯৫ সাল**)** গ্রামের মানুষের জীবনে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাঃ—----------

সামাজিক অবস্থাঃ গোহাইলবাড়ি গ্রামে তখন (১৯৯০/৯৫ সাল) সম্ভবত একটি সমাজ ছিল। গ্রামের প্রায় ১০০/১২০ টি পরিবার মিলে এই সমাজ পরিচালিত হত। সমাজের বিভিন্ন সমস্যাতে সবাই একজায়গায় বসে পরামর্শ করে সমস্যা সমাধান করতো। সমাজের মানুষ একে-অপরকে সহযোগিতা করতো। সমাজ থাকার সুবিধা হল বিয়ে শাদিসহ বিভিন্ন

অনুষ্ঠানে সমাজের সবার সম্মিলিতভাবে কেনা বিভিন্ন জিনিসের সাহায্য পাওয়া যেত। যেমন ছামিয়ানা, বড় রান্না করার ডেক, প্লেট, গ্লাস ইত্যাদি। এছাড়া সমাজের মানুষের প্রতি ন্যায় বিচারের কাজেও সমাজ থেকে সহযোগিতা করা হত।

মরহুম মোঃ আফাজউদ্দিন ও মরহুম মোঃ শাহজদ্দিনদের বাড়িতে সামাজিক ও ধর্মীয় কাজ হত। ধর্মীয় কাজ বলতে একসাথে মিলাদ পড়া, ঈদের দিন একসাথে সেমাই খিচুরি খাওয়া, এছাড়া বিভিন্ন ইসলামিক অনুষ্ঠান পালন যেমন মিলাদ পড়া ইত্যাদি।

মরহুম মোঃ আফাজউদ্দিন মোল্লাকে সবাই আফা ডাক্তার বলে ডাকতেন। তিনি দেখতে খুব সুন্দর, ফর্সা, লম্বা, সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। নিজের বাড়িতে জমিজমা ও সামাজিক ধর্মীয় কাজ দেখাশুনার পাশাপাশি হোমিও প্যাথিক চিকিৎসার কাজ করতেন।

মুখে দাঁড়ি, পড়নে সাদা পাঞ্জাবি, পায়জামা পড়ে চলাফেরা করতেন। নিয়মিত নামাজ পড়তেন। সয়দাবাদ মসজিদে পরিচালনা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর সন্তানেরা সবাই শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। প্রচুর জমিজমার পাশাপাশি বিশাল আকারের উনার বাড়ি যা সমাজের মাতবারের থাকা উচিৎ তা উনার ছিল। যদিও উনি তেমন মাতবারির কাজ করতেননা, উনার ছোট মাতবারির কাজ দেখাশুনা করতেন।

মরহুম মোঃ আফাজউদ্দিনের ছোট ভাই মরহুম শাহাজদ্দিন গ্রামের মাতবারির কাজ করতেন বলে সবাই উনাকে শাহজদ্দি মাতবার বলে ডাকতেন। গোহাইলবাড়ি, গোয়ালখালী এলাকার মধ্যে দাপটে মাতবার হিসাবে উনার বেশ সুনাম ছিল। মরহুম মোঃ শাহজদ্দিন মাতবরের মুখে দাঁড়ি ছিল, ফতুয়া, লুঙ্গী পড়তেন।

মরহুম মোঃ আফাজউদ্দিন সাহেব এর বাড়িতে ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান সামাজিকভাবে হত। গ্রামের মাতবার হিসাবে মরহুম মোঃ শাহজদ্দিন দায়িত্ব পালন করতেন। যদিও এই দুই বাড়ি গোহাইলবাড়ি গ্রামের মধ্যে পুরাপুরি ছিলনা, গ্রামের শেষ অংশে উত্তর-পশ্চিম দিকে গোয়ালখালির কিছু অংশে মিলিত ছিল। কিন্তু যেহেতু অনেক আগে থেকে গ্রামের সামাজিক কাজ ও ধর্মীয় কাজ এই বাড়িতে হত এবং গ্রামের মাতবরের দায়িত্ব শাহজদ্দিন মাতবার পালন করতো, তাই তাদের অনেক প্রভাব ছিল। উনারা খুব ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন, অনেক জমিজমা ছিল উনাদের।

সামাজিক কাজের মধ্যে বিয়ে শাদি, মুছলমানি, দাফন-কাফন, ঈদ উপলক্ষে ঈদের দিন একসাথে বসে পরামর্শ করা, সেমাই খিচুরি খাওয়া, শবে বরাতে হালুয়া রুটি খাওয়া, মাঝে মাঝে সবাই মিলে মিলাদে অংশ নেওয়া, বিচার-আচার সম্পাদন করা ইত্যাদি।



(১৯৯০/৯৫ সালে পালকিতে করে নববধুকে স্বামীর বাড়িতে নিয়ে আসা হত)

বিয়ে শাদিতে প্রচুর আনন্দ হত। বিয়ের ব্যাপারে সাধারণত ছেলের পক্ষ মেয়ের পক্ষের বাড়িতে প্রস্তাব পাঠাত। প্রস্তাবে মেয়ের পক্ষ প্রাথমিকভাবে রাজি হলে উভয়ের দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা হত মেয়ের বাড়িতে। বিয়ের ব্যাপারে সমাজের পক্ষ থেকে মাতবার নিজে উপুস্থিত থাকতেন, সুন্দরভাবে যাতে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয় সেই জন্য মাতবারসহ সমাজের পক্ষ থেকে লোকজন উপুস্থিত থাকতো।

সমাজের পক্ষ থেকে বিয়ের দিন সামিয়ানা, ডেক, প্লেট গ্লাস ইত্যাদি দেওয়া হত। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে এগুলো আবার মাতবারের বাড়িতে ফেরত দেওয়া হত।

মুছলমানি অনুষ্ঠানে মুছলমানের ছেলেদেরকে হাজামের দ্বারা মুছলমানি করানো হত। এই উপলক্ষে নিজস্ব আত্বীয় স্বজনদের পাশাপাশি সমাজের মানুষ দেখতে আসতো। কেউ কেউ বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সমাজের মানুষদেরকে দাওয়াত দিত।

মুছলমানির অনুষ্ঠানেও সমাজ থেকে ছামিয়ানা, প্লেট গ্লাস, পাটি, ডেক ইত্যাদি দিয়ে হেল্প করা হত। তখনকার সময়ে মাটিতে পাটি বিছিয়ে বড় বড় অনুষ্ঠানে মানুষ খানা খেত।

সমাজের সবাই ঈদের দিন বা অন্য কোন ধর্মীয় মিলাদের দিন একত্র হয়ে মিলাদ পড়তো। ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলতে ঈদের দিন ঈদের নামাজ আর বিভিন্ন উপলক্ষে মিলাদকেই মনে হত। অল্পকিছু লোক জুমার নামাজ পড়তেন।

মিলাদের দিন অথবা ঈদের দিন মরহুম মোঃ আফাজউদ্দিন মোল্লার বাড়িতে সবাই একত্রিত হত। সবাই মিলে যার যার বাড়ি থেকে আনা ক্ষীর, খিচুরি, সেমাই খেত। রুটি-হালুয়া সাধারণত বিভিন্ন মিলাদ উপলক্ষে সবাই নিয়ে আসতো এবং একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া হত।

সারিবদ্ধভাবে সবাই পাটি পেত বসতো। বিভিন্ন বাড়ি থেকে আনা রুটি, হালুয়া একজায়গায় একত্রিত করা হত। গ্রামের কিছু সাহসী লোক খানাপিনা সরবরাহ করতো। এরআগে অবশ্য নির্দিস্ট মোল্লা সাহেব মিলাদ পড়াতেন, নামাজ পড়ার প্রতি উৎসাহ দিতেন, নছিহত করতেন। মিলাদ পড়তে পড়তে অনেক রাত হয়ে যেত। মোল্লার জন্য মোল্লাকি খরচ তোলা হত।

মিলাদের দিন সমাজের মানুষ একত্রিত হত। সবাই মাথায় টুপি, পড়নে পাঞ্জাবি, লুঙ্গি বা ভাল কাপড় চোপর পড়ার চেস্টা করতো।

গ্রামে ২০২১ সালে মসজিদ নির্মিত হওয়ার পরে থেকে সবাই ঈদের দৈনন্দিন ৫ ওয়াক্ত, জুমার নামাজসহ ঈদের নামাজও মসজিদের সাথে লাগানো মসজিদ প্রাঙ্গনেই ঈদের নামাজ আদায় করেন।

এরপূর্বে অবশ্য সৈয়দাবাদ মসজিদ যা গোয়ালখালী ও সৈয়দাবাদ এলাকায় অবস্থিত সেখানে গিয়ে এই গ্রামের সবাই ঈদের নামাজ আদায় করতো।

শুধুমাত্র ঈদের নামাজের জন্যই সবাই সৈয়দাবাদ মসজিদে বছরে ২ দিন যেত। যদিও অল্প কিছু মানুষ জুমার দিন সৈয়দাবাদ মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করতে যেত বলেও মনে হত। এছাড়া নালী বাজার মসজিদেও জুমার নামাজ পড়তে অনেকে যেত কিন্তু এই সংখ্যা খুবই কম ছিল।

নিচের  ছবিতে ছবি তুলছেন গ্রামের মোঃ সুরুজ মিয়া। দাঁড়ানো সবার ডানে আশিক, ফজল খান, আলমগীর হোসেন, জাহিদুর রহমান, মোঃ নুরুল ইসলাম, মোঃ জসিম উদ্দিন, মোঃ ইয়াসিন আরাফাত ও রেজা দাঁড়িয়ে আছে।



(ছবিটি সম্ভত ২০২২ সালের ঈদের দিনের ছবি)

বর্ষাকালে কখনও কখনো নৌকায় করে মরহুম মোঃ আফাজউদ্দিন মোল্লার বাড়িতে এসব মিলাদে গ্রামবাসী যেত। যাদের নৌকা ছিল তাদের মধ্যে হায়াত আলী অন্যতম। তিনি তাঁর নৌকায় করে গ্রামের মানুষদেরকে নিয়ে যেতেন আবার পৌঁছে দিতেন।

এসব নৌকায় চলাফেরার পাশাপাশি ইছামত নদী বা পদ্মা নদীতে মাছ ধরার কাজেও ব্যবহার হত। গ্রামের মানুষের চলাচলের একমাত্র সম্বল ছিল এসব নৌকা।



(তৎকালীন সময়ে অর্থাৎ ১৯৯০/৯৫ সালে বর্ষাকালে এধরনের নৌকার সবাই চলাফেরা করতো।)

বর্তমানে (২০২৪) গোহাইলবাড়ি গ্রামের মানুষ ৩/৪ টি সমাজে বিভক্ত হয়ে গেছে। মোঃ লুতফর রহমানের সমাজ, মোঃ আব্দুল কুদ্দুসদের সমাজ, দড়ি কয়রা গ্রামের মোঃ ওয়াহেদ মাতবারের সমাজে আছে কিছু মানুষ। মরহুম আফাজউদ্দিন মোল্লার বাড়ির সমাজতো রয়েছেই। এছাড়াও গ্রামের কিছু মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে এই গ্রামের বাইরেও অন্য এলাকার সমাজের অনুর্ভুক্ত হয়েছে।

সমাজ দিন দিন ছোট হয়ে আসছে। এখন আর্থিক অবস্থার উন্নতির ফলে কেউ আর সমাজের মাতবারদের প্রাধান্য দেয়না। এছাড়া মেম্বার, চেয়ারম্যান সরাসরি সমাজের বিচার কার্য করে, ডেকোরেশন এর দোকানে বিয়েসহ সকল অনুষ্ঠানের জিনিস সহজে পাওয়া যায়। যারফলে কেউ আর কারো উপর নির্ভরশীল না হওয়াতে খুব সহজে এক সমাজ ছেড়ে অন্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মানুষ।

রাজনৈতিক অবস্থাঃ গোহাইলবাড়ি গ্রামের মানুষ রাজনীতির সাথে তেমন কেউ অতঃপ্রতভাবে জড়িত ছিলনা। প্রায় সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকতেন, আর্থিক সমস্যা প্রায় সবার ঘরে থাকায় কেউ তেমন রাজনীতি বিষয়ে মাথা ঘামানোর সময় পেতেননা। তবে সবাই দেশের প্রধানমন্ত্রী কে হচ্ছে, কোন দল ক্ষমতায় আছে এগুলো নিয়ে চিন্তা করতেন, আনন্দ করতেন, সমালোচনা করতেন। এছাড়া গ্রামের মানুষ ভোট দেওয়ার ব্যাপারে খুব আগ্রহ অনুভব করতেন, ভোট দিতেন, ভোটের সময় নিজ নিজ মতামত পেশ করতেন।

মরহুম প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন গ্রামাঞ্চলে ইরি ধান, খাল খনন করে সেচের ব্যবস্থা করে চালের অভাবে দূর করার চেস্টা করেছিলেন যা গ্রামের মানুষ এখনও মনে রেখেছে। মানিকগঞ্জ জেলার বিভিন্ন এলাকায় উনি সরাসরি খাল খনন করেছিলেন বলে জানা যায়। যারফলে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতি গ্রামবাসীর ভালবাসা ছিল প্রচুর। এছাড়া ১৯৯০/৯৫ সালে মানিকগঞ্জে তৎকালীন এপপি মরহুম হারুনুর রশিদ খান মুন্নু সাহেব আর্থিকভাবে প্রচুর হেল্প করেছিলেন যা মানুষ মনে রেখেছিল। যার ফল শ্রুতিতে মানিকগঞ্জ জেলায় বিশেষ করে আমাদের গ্রামে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেব এর দল বিএনপি এর খুব জনপ্রিয়তা ছিল। গ্রামের অল্প কিছু হিন্দু মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দল আওয়ামী লীগকে পছন্দ করতো। হিন্দু সম্প্রদায়েরা আওয়ামী লীগ দলকে তাদের জন্য নিরাপদ মনে করতো। কারণ আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের সহযোগিতার কথাটি স্মরণ করে হিন্দুদের সহযোগিতা করতো বা করে। এইজন্য হিন্দু সম্পদায় আওয়ামীলীগকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে এবং ভোট দেয়।

আমাদের গ্রামের লোকজনের মধ্যে সবাই নিজ কাজে ব্যস্ত থাকতো বেশি, এরপরেও অল্পকিছু লোক সরাসরি রাজনীতি করতো। যেমন, রফিক সাহেব ও ডাক্তার রহিম এর পিতা মরহুম রহমত আলী রাজনীতি করতেন। শহিদুল ইসলাম ও হায়দার আলীর পিতা মরহুম মোহন মোল্লা রাজনীতি করতেন।

আরো অনেকেই হয়তো ইউনিয়ন পর্যায়ে বা গ্রাম পর্যায়ে রাজনীতি করতেন তবে তেমন জোরে শোরে নয়।

আমাদের গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ বিএনপির পক্ষে থাকতেন, অল্প কিছু লোক আওয়ামীলীগ বা মরহুম এরশাদ এর জাতীয় পার্টি করতেন। তবে কখনও এই নিয়ে কারো সাথে তর্ক বা সংঘর্স হতনা। এখনও হয়না।

যার যার মতামত অনুযায়ী ভোট দেয়, কাউকে সমর্থন করে বা করেনা কিন্তু সবাই মিলে মিশে থাকে।

মেম্বার, চেয়ারম্যান এর ভোটের ক্ষেত্রেও প্রায় এরকম।

ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোটের সময় গ্রামে অনেক আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হত। উৎসব মুখর পরিবেশ সৃষ্টি হত। ঘরে ঘরে ভোট নিয়ে আলোচনা হত, আনন্দ হত, পরস্পর তর্ক বিতর্ক হত তবে বিশৃঙ্খল পরিবেশ কখনও হতনা।

## ৪। গ্রামের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় কুসংস্কারঃ

গোহাইলবাড়ি গ্রামে অল্প কিছু হিন্দু পরিবার বাদে সবাই মুছলমান। গ্রামের মধ্যভাগ দিয়ে একটি হালট চলে গেছে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে। নালী বাজার থেকে একটি রাস্তা সোজা দক্ষিন থেকে উত্তর দিকে চলে গেছে গোয়ালখালী হয়ে উখুলী পর্যন্ত। এই রাস্তার পূর্ব দিকে ইছামতি নদী, কে আলী খান ব্রিজ, সৈয়দাবাদ ব্রীজ।

গ্রামের প্রবেশ পথে কদমতলা থেকে গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া হালট বা রাস্তাটি চলে গেছে গ্রামের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ মোঃ হায়াত আলী (জাহিদ, শহীদ এর বাবা) এর বাড়ি অতিক্রম করে খাল পর্যন্ত।

গোহাইলবাড়ি গ্রামের পশ্চিমে একটি খাল রয়েছে, এই খালের পশ্চিম পাশে বিরাট চক রয়েছে।

গ্রামের হালটের দক্ষিন দিকে কয়েকটি মুসলিম পরিবার বাদে প্রায় সবাই হিন্দু। যেমন, পরেশ সাহা (সীমা, কামনা, যমুনার বাবা), নিমাই সুত্রধর (অসীম এর বাবা), মৃত ফনিন্দ্র সুত্রধর (গৌরাঙ্গ সুত্রধর এর বাবা), ফেলা সুত্রধর (শান্তি এর বাবা), বংশী সাহা ( সুজনের বাবা) এর বাড়ি। আরো পশ্চিমে বাবুল সাহা ( বাপ্পা এর বাবা), মৃত নীলু সাহা এর বাড়ি। এসব বাড়ির পশ্চিমে দেবেশ সাহাসহ আরো কয়েকটি হিন্দু বাড়ি আছে।

এসব হিন্দু বাড়ির মধ্যে তাদের ধর্মীয় আচার আচরণ খুব কঠোরভাবে মেনে চলেন। তারা একসময় মুছলমানদের সাথে চলাফেরায়, কথা বার্তায়, কাজে কর্মে তাদের ধর্মীয় নিয়ম খুব মেনে চলতো। পরে শিক্ষার উন্নতিসহ বিভিন্ন কারনে কিছুটা এই কঠরোতা কমিয়ে দিয়েছে।

যেমন, এসব হিন্দুরা মুছলমানদের ছায়া পাড়াতে চাইতোনা, ঘরে প্রবেশতো অসম্ভব ব্যাপার ছিল, বাড়িতে গেলে এটা ছোয়া যাবেনা, ওটা ধরা যাবেনা বিশেষ নিয়ম কানুন ছিল। রবিবার, মঙ্গলবার বাঁশ গাছ কাটা যাবেনা, সকাল সন্ধ্যা উলুধ্বনি ইত্যাদি ধর্মীয় আচার তারা পালন করতো। হিন্দুদের পূজা পার্বনসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মুছলমানের ছেলে-মেয়েরা দেখতে যেত। বাবুল সাহা এর বাড়িতে দুর্গা পূজায় মূর্তি নির্মানসহ বড় করে অনুষ্ঠান হত। এসব অনুষ্ঠানে ঢাক-ঢোল বাজানো, খিচুরি রান্না করে খাওয়ানো হত। খিচুরি, পায়েস ইত্যাদি খেতে হিন্দুদের পাশাপাশি মুছলমানেরাও অংশ নিত। যদিও মুছলমানদের জন্য কলার পাতার কেটে টুকরা করে একেক জনকে আলাদা আলাদা করে খাবার দেওয়া হত।

হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতি মুছলমানদের মধ্যেও দেখা যেত। এখনও অনেক কিছুই মুছলমানেরা হিন্দদের মত করে করে থাকে। যেমন, বিয়ে শাদিতে দিন ক্ষণ ঠিক করার জন্য হিন্দুদের মতন পঞ্জিকা অনেকেই দেখে, শুভ দিন বা অশুভ দিন খোঁজ ইত্যাদি। বিয়ের মধ্যে হিন্দুদের মতন কপালে ধান-দুবলা দিয়ে বরণ করা, সিঁদুরও কোন কোন মুছলমানের বিয়েতে নিতে দেখা যায়- এভাবে হিন্দুদের বহু ধর্মীয় রীতিনীতি, কুসংস্কার মুছলমানদের মধ্যে চলে এসেছে।

এর একটি বড় কারণ হল- মুছলমানদের দারিদ্রতা ও ধর্মীয় শিক্ষাসহ স্কুলের শিক্ষা থেকে দূরে থাকা।

গ্রামের দক্ষিন পাশের মুছলমান বাড়ির মধ্যে কাজি আব্দুল খালেক রতন, কাজি রফিকুল ইসলাম, শেখ বলাই (রাজ্জাক, রাজিবের বাবা), বিনাত আলী (নুরুল ইসলাম এর বাবা), জুমাত আলী (মেহেদী হাসান, হানিফের বাবা), শেখ বাবর আলী (ফজল, রেজ্জাক, বারেক এর বাবা), মরহুম মোস্তফা (রাহুল এর বাবা), আব্দুল (শাহিন এর বাবা), মৃত আক্তার মোল্লা (ফজলুর রহমান এর বাবা), মোঃ দুলাল মোল্লা ( সুরুজ, সুজন এর বাবা)সহ কয়েকটি পরিবারের বসবাস।

গ্রামের উত্তর পাশের সবাই মুছলমান। এসব মুছলমান পরিবারের মধ্যে ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় প্রভাব খুবই কম ছিল।

হালাল-হারাম বুঝে চলা, শির্ক না করা, কুফুরি কাজ বা কথা না বলা ইত্যাদি ব্যাপারেও তেমন সচেতনতা ছিলনা।

মুছলমানদের জীবনে বিভিন্ন কুসংস্কার, খারাপ আকিদার পিছনে বড় কারণ ছিল অভাব অনটন, অসচতেনতা, শিক্ষার অভাব, ধর্মীয় শিক্ষার অভাব এবং পাগল ও মারফত তরীকার পীরদের ভূমিকা।



(গোহাইলবাড়ি গ্রামে মরহুম মোঃ আবু পাগলের বাড়িতে প্রতি বছর নিয়মিত গানবাজনা হত, এখনও হয়)

গ্রামের যেহেতু অধিকাংশ লোক গরীব ছিল তাই তারা সবসময় নিজের পেটের ধান্দায় থাকতো। কিভাবে দিনশেষে তিন বেলা কিছু খাওয়া যাবে সেই চিন্তায় মাথায় সর্বক্ষণ থাকতো। যারফলে ইসলামিক আকিদা, নামাজ, হালাল-হারাম, যায়েজ-নাজায়েজ ইত্যাদি বিষয়ে ভাবার সময় ছিলনা। মাঝে মাঝে মিলাদ অনুষ্ঠিত হত, কেউ মারা গেল ৭ দিন, ৪০ দিন ইত্যাদি সময় পরে ফয়তা খাওয়ার বা খাওয়ানোর প্রচলন ছিল। শবে বরাতে হালুয়া রুটি খাওয়ার জন্য সবাই তৎকালীন মাতবর মরহুম ডাঃ আফাজউদ্দিনের বাড়িতে একত্রিত হত। মিলাদে সুর করে দরদ ও রাছুল (সাঃ) শানে বিভিন্ন গজল, কবিতা পাঠ করা হত। গ্রামের নির্ধারিত মোল্লা এসে মিলাদ পড়াতেন। মোল্লাকে খুব সম্মান করা হত। মোল্লা মিলাদ পড়ানোর সময় নামাজের কথাও বলতো কিন্তু অধিকাংশ লোকই নামাজ আদায় করতোনা। মিলাদ পড়াকেই ইসলামের গুরুত্বপূর্ন আমল মনে করতো। কারণ, মিলাদ বছরে ২/১ বার বা কেউ ইন্তেকাল করলে খিচুরি খাওয়ার ব্যবস্থা করে মিলাদের আয়োজন করা হত। এটা সহজ, কারণ এখানে তেমন কষ্ট হয়না, ওজু, গোছলের বা নামাজের কথা তেমন বলা হয়না। তাই মিলাদ খুব জনপ্রিয় ছিল।

চৈত্র মাসে ৭ দিন একটানা রাতের বেলা ফার্সি ভাষায় সম্ভবত সুর করে কিছু কথা বলা হত। “হায়াজে মাওলা দেশা হে ময়শা, ওলে মোস্তফা ওলে মর্তুজা ওলে আমিনা,--- ইয়ার  ফি আলী আলী বলে মাঝে চিৎকার করে শোনানো হত এখনও হয়। গভীর রাতে এই কাজ করা হয়। এটাকে খুব গুরুত্বপূর্ন আমল মনে করা হয়। ৭ রাতে এভাবে গ্রামের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ঘুরে আসা হয়। গ্রামের ছোট-বড়, যুবক-বৃদ্ধ সবাই এতে অংশ নেয়। লাইন ধরে একজনের পিছনে আরেকজন- এভাবে চলতে থাকে আর মুখে থাকে- ওলে মোস্তফা, ওলে মর্তুজা ওলে আমিনা—- - - ইয়ার ফি আলী আলী। গ্রামের তৎকালীন আরেক মাতবার মরহুম লোকমান আলির বাড়ি থেকে এই কাজ আগে করা হত। এরপরে গ্রামের মাতবার মরহুম মোঃ মোহন মোল্লা এই কাজে লিডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি মাঝে মাঝে জোরে জোরে ইয়ার ফি আলী আলী বলতেন, আবার অন্যরাও বলতেন যেমন মোঃ ছামছের আলী। বর্তমানেও এই রেওয়াজ চালু আছে।

একটানা ৭ রাত এই জিকির করার পরে গ্রামের রাস্তায় কদম তলায় শির্নির আয়োজন করা হত, এখনও হয়। এই দিন আবার মিলাদের আয়োজন করা হয়, মিলাদ শেষে শির্নি বিতরণ করা হয়। কাকতলীয়ভাবে হোক আর যেভাবেই হোক ঐ সময় বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এই বৃষ্টিকে সবাই রহমতের বৃষ্টি মনে করা। এই জিকির যিনি চালু করেছিলেন তিনি একজন মোল্লা ছিলেন। তিনি নামাজী ছিলেন, সুন্নাতের উপরে চলতেন। এই জিকিরের মাধ্যমে গ্রামের সকল প্রকার অকল্যাণ, ভুত পেতের আছর দূরীভূত হবে বলে সবাই মনে করতো। গোহাইলবাড়ি গ্রামের পূর্বে নদীর উপারে দড়ি কয়ড়া গ্রামের মরহুম হজ্ব মোল্লা, এরপরে বর্তমানে ফাইজদ্দিন মোল্লা- উনারাই এসে এই মিলাদ পড়াত। উনাদেরকে গ্রামের মানুষ অনেক দ্বীন বিষয়ে বিজ্ঞ মনে করতো, সম্মান করতো।

গ্রামের মধ্যে কিছু মারফতের লাইনের পীরের আগমন ছিল। এসব মারফতের পীরেরা গান-বাজনা পছন্দ করতো। তাদের মুখের কথা শোনার জন্য রাত জেগে মানুষ বসে থাকতো। তারা মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে, রাছুলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে, আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলতো। নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বুঝানোর চেস্টা করতো পীরকে সম্মান করলে, ভালবাসলে আল্লাহকে পাওয়া যাবে। এভাবে তাঁরা তাদের সহজ সরলমনা ভক্তদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতো। নামাজ, পর্দা এগুলো মনের ব্যাপার, মারফতের স্তরে পৌছালে এগুলো লাগেনা ইত্যাদি বলে যারা নামাজ পরে তারা তাদের চেয়ে অনেক নিচু স্তরের বুঝানোর চেস্টা করতো। কিছু মারফতের পাগল টাইপের মানুষ ছিল গ্রামে। যেমন জালাল পাগল, আবু পাগল প্রমুখ। জালাল পাগল সারাক্ষণ বিরবির করে কথা বলতো, সারা গায়ে দাদ-চুলকানি ছিল, সবসময় বিড়ি একটার পরে আরেকটা চলতো। তাকে অনেক বড় আল্লাহর ওলী মনে করা হত। সে গায়ের জানে মনে করা হত। ভবিষ্যতের ব্যাপারে সে অগ্রিম কথা বলতে পারতো। অসুখ-বিসুখ, অভাব অনটনে, বিপদে-আপদে মানুষ তাঁর কাছে আসতো। মরহুম আবু পাগল ছিল এই মরহুম জালাল পাগলের ভক্ত। আবু পাগলের কাছে লোকজন বিভিন্ন সমস্যার জন্য আসতো। তিনি ঝাড় ফুঁক করতেন। অনেকেই ভাল হত। তিনি নিজেকে মারফতের কামেল পাগল বলে মনে করতো। গ্রামের অশিকাংশ মানুষ উনাকে বিশ্বাস করতো, ভয় করতো। উনি কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তাঁর অমঙ্গল হবে বলে মনে করতো। আবু পাগলের বাড়িতে মাঝে মাঝে কাশেদ আসতো। কাসেদরা হায় হোসেন, হায় ইমাম বলতে বলতে দলবেধে আসতো। রাস্তায় তারা ধারালো তলোয়ার দিয়ে কলা গাছ কাটতো। তাদের পড়নে হাফ প্যান্ট ও গায়ে গেঞ্জি, হাতে তলোয়ার থাকতো।

এই বাড়িকেই কেন্দ্র করে আসলে পুরা গ্রাম পরিচালিত হত। কয়েক দিন পরপরে এই বাড়িতে গান-বাজনার আয়োজন করা হত। গান শেষে একে-অপরকে ধরে কুলাকুলি করা হত এবং খিচুরির আয়োজন করা হত। গানের মধ্যে শরিয়াত-মারফত পালা থাকতো। শরিয়াত মানে নামাজ, রোজা যারা করে তাদেরকে বুঝানো হত। মারফত মানে এসব পাগলদের কার্যাবলীকে বুঝানো হত। গানের মাধ্যেম শরিয়াতের উপরে মারফত এটা বুঝানোর চেষ্টা করা হত। মারফতের পাগলরা শরিয়াতের সিমা অতিক্রম করে ঐ স্তরে পৌছে গেছে। মারেফতের স্তরে পৌছে গেলে আর নামাজ, রোজা লাগেনা। এসব পাগলেরা তাই নামাজ পড়েনা। ফকির লালন শাহ এর মানব ধর্ম, শিয়াদের সাহাবা (রাঃ) দের বিরোধী আকিদা, মনে যা চায় তাকেই ইসলাম বলে চালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কাজ এরা বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছিল। যেমন, লালন শাহ এর মতে মানবতাই ধর্ম, মানুষ সবার উপরে। নামাজ, পর্দা মনের ব্যাপার। যার যেটা ভাল লাগলে করতে পারে, নাও করতে পারে। ইসলামের কিছু কথা, হিন্দুদের কিছু কাজ, নিজের মনগড়া কিছু কাজ মিলে লালন ধর্ম। এই ধর্মে নামাজ, রোজা, পর্দার জন্য কাউকে বাধ্য করা যাবেনা, মনে যা চায় তাই করতে পারবে। একইভাবে এদের মধ্যে আল-কুরআন সুন্নাহ বিরোধী একটি মনোভাব সৃষ্টি করা হয়েছে গান-বাজনার মাধ্যমে। নতুন প্রজন্মের মুছলমান ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও নামাজ, পর্দা ইসলামের মূল বিষয়ের প্রতিও বিদ্বেষ মনোভাব সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যদিকে ছেলে-মেয়ে একসাথে অবাধ চলাফেরাকে মারফতের নাম দেওয়া হয়েছে। যারফলে, যুবক-যবতীরা এটাকে বিরাট সুযোগ মনে করে মারফতের দলে চলে যায় এবং ইসলাম বিরোধী মনোভাবসম্পন্ন হয়ে উঠে। কারন ইসলামি পর্দা করা ফরজ, নামাজ ফরজ। ইসলামের সুমহান আদর্শ অর্থাৎ আল-কুরআন ও রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর আদর্শ থেকে গোহাইলবাড়ি গ্রামসহ আরো বহু গ্রামের মানুষকে এভাবে এসব মারফতের নামধারী পীর ও পাগলরা নিজেদের স্বার্থের জন্য দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

বহু কুসংস্কার, শির্কি আকিদা এসব মারফতের পীর ও পাগলদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা এখনও বিদ্যমান আছে।

অসুখ-বিসুখ, বিপদ-আপদ, অভাব-অনটনে সরলমনা মানুষগুলো এদের কাছে আসতো। তখন তারা ঝারফুঁক করতো, এতে অনেকে অসুখ সেরে যেত। এভাবে তাদেরকে নিজের ভক্ত বানান হত। অনেকেই বিপদে পরে আসতো, তখন তারা সাহস দিত, শান্তনা দিত। কোন কারনে বিপদ কেটে গেলে, অভাব দূর হলে এটা ঐ পাগল বাবার কেরামতি মনে করতো। এভাবে এসব পাগলরা মানুষদেরকে অন্ধ ভক্ত বানিয়ে মহান আল্লাহর ইবাদতের কথা ভুলিয়ে দিয়ে শির্কে লিপ্ত করার চেষ্টা করতো।

বন্যায় গ্রামের চিত্রঃ **(**কলা গাছের ভেলা, সমস্ত গ্রাম ডুবে যাওয়া, খাদ্যের অভাব**)**

১৯৯০/৯৪ সালের দিকে গ্রামে বর্ষার সময় প্রতি বছর সমস্ত গ্রাম পানি দ্বারা ডুবে যেত। গ্রামের পূর্ব পাশে থাকা ইছামতি নদী, পশ্চিমে খাল পেরিয়ে গ্রামে পানি প্রবেশ করতো সহজেই। গ্রামের পূর্বে দিকে থাকা রাস্তা যেটা নালী বাজার থেকে গোয়ালখালী হয়ে উখুলী চলে গেছে সেই রাস্তা অনেক নিচু ও সুরু ছিল। রাস্তার মাঝে মাঝে ভাঙ্গাও ছিল। বর্ষাকালে রাস্তার মধ্যে পানি উঠতো, কিছু জায়গায় বাঁশের পুল দেওয়া লাগতো, কখনও স্রোতের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় পানিতে ডুবে যেতে হত।



(বন্যার সময় এভাবে কলা গাছের তৌরি ভেলা দিয়ে অধিকাংশ মানুষ পারাপার হত)

বর্তমানে (২০২৫) যেখানে কে আলী খান ব্রিজ, সেখানে তখন একটি বড় তালগাছ ছিল। ঐ ব্রিজের কাছে নালী বাজার ও দড়িকয়রা যাওয়া মানে নদীর এপার থেকে ওপারে যাওয়ার জন্য মরহুম মাওলা নামে এক ব্যক্তি নৌকা দিয়ে হেল্প করতো।



গ্রামের মধ্যে ২/১ জনের পারাপারের জন্য নৌকা ছিল, এছাড়া তেমন কারো নৌকা ছিলনা। জাহিদ, শহীদের পিতা হায়াত আলীর নৌকা ছিল একটু বড়, তিনি সবাইকে পারাপারে হেল্প করতেন। এছাড়া কয়েকজনের ছোট নৌকা ছিল। অধিকাংশ মানুষ কলা গাছের তৌরি ভেলা দিয়ে চলাফেরা করতেন। দিনমজুর মানুষেরা বেকার হয়ে যেতেন। ঘরে প্রায় সবারই খাবারের অভাব দেখা দিত। সরকারি ত্রানসহ বিভিন্ন লোকের সহযোগিতার জন্য সবাই উন্মুখ হয়ে থাকতেন।



(সবার সমস্যা শুনে সমাধানের সর্বাত্বক চেষ্টা করতেন জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন। তিনি এসময় যার যেটা প্রয়োজন দেওয়ার জন্য সরাসরি সবার খোঁজ খবর নিয়ে কখনও খাদ্য, কখনও নগদ টাকা বা কখনও ঘর তোলার এবং কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা বা কাউকে গরু, বকরী ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দিতেন।)

বর্ষা কখনও কখনও বন্যায় রূপান্তরিত হয়ে যেত। তখন আরো দুর্ভোগে বেড়ে যেত। এসব অবস্থায় ঘরের মধ্যে মাচা বানিয়ে লোকজন বসবাস করতো। সাপ, ব্যাংসহ বিভিন্ন প্রাণীর উপদ্রুপ বেড়ে যেত।

গরু, বকরী, হাঁস মুরগী যাদের ছিল তাদের কষ্ট আর বেশি হত। মাটির তৌরি ভ্রাম্যমান চুলায় লোকজন রান্না করতো।

নালী বাজারে হাটের দিন ও গোহাইলবাড়ি গ্রামবাসীঃ

নালী বাজারে হাটের দিন গোহাইলবাড়ি গ্রামের মানুষ কেনা-বেচার জন্য যেত। সপ্তাহে দুই দিন হাট বসতো, সোমবার ও বৃহস্পতিবার।



(নালী হাট)

হাটের দিন গ্রামের মানুষেরা নিজেদের হাতে বানান বিভিন্ন জিনিস বিক্রয় করতো। যেমন কেউ খেজুর পাতা দিতে পাটি বানিয়ে বিক্রি করতো। কেউ কেউ মাছ ধরে এনে বিক্রি করতো। আবার কেউ আখ (কুসুল) বিক্রয় করতো ইত্যাদি।



(নালী হাটে গোহাইলবাড়ি গ্রামের মোঃ ছোহরাব আলী)

খেজুরের গুড় যারা বিক্রি করতো তাঁর মধ্যে মরহুম মোঃ মোছলেম উদ্দিন অন্যতম। তিনি খেজুর গাছ কাটতেন এবং রস পেরে নিজের বাড়িতে রস জ্বাল দিয়ে গুড় বানিয়ে নালী হাটে বিক্রি করতেন।




(খেজুরের রস দিয়ে গুড় বানান হত, খেতে খুব মিস্টি আর সুস্বাদু)

এছাড়া বাড়িতে হওয়া বিভিন্ন ফলমুল যেমন গাব, পেঁপে, নারিকেল, পেয়ারা, কলা বিক্রয় করে প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র ক্রয় করতো।

যারা দিন মজুর ছিল, এই দিনে অর্থাৎ হাটের দিনে তাদের মজুরী দিতেন মহাজনেরা।

গোহাইলবাড়ি গ্রামের মানুষ খুব শান্তি প্রিয় ছিলেন এবং অল্পতেই খুশি হয়ে যেতেন। হাটের দিন তারা সপ্তাহের বাজার করে ফেলতেন।

শিশিতে করতে সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল কেউ ১০০ গ্রাম, কেউ ৫০ গ্রাম আর একমাত্র ধনীরাই ২৫০ গ্রাম তৈল কিনতো। কেরোসিন তেল দিয়ে কুপি বাতি জ্বালিয়ে রাতে ঘর আলোকিত করা লাগতো, বিদ্যুৎ ছিলনা। হেরিকেন জ্বালিয়ে রাতে চলাফেরা বা কাজ করা লাগতো। এসব কাজে কেরোসিন তৈল ব্যবহার হত। সরিষার তৈল রান্নার কাজে এবং নারিকেল তৈল মাথায় দেওয়া হত।



(এভাবে করে ১৯৯০/৯৫ সালে তৈল বিক্রয় করা হত। তখন সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল ও কেরোসিন তৈল বিক্রয় হত। সয়াবিন তৈল তখনও তেমন গ্রামের মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেনি।)

চালের দাম তখন প্রতি কেউ ৫/৬ টাকা বা তার কম ছিল। গমের দাম আরো কম ছিল। চালের পাশাপাশি অনেকেই আটার রুটি খেত। শাকসবজি ও মাছ প্রচুর পাওয়া যেত, দাম খুবই কম ছিল।

বিভিন্ন রকমের পেশার মানুষঃ **(** কৃষি কাজ, সবজি বিক্রি, মাটি কাটা, হকারি করা, নৌকার ব্যবসা, মাছ ধরা, ফলমুল বিক্রি করা, গান গাওয়া **)**

গ্রামের অধিকাংশ লোক কৃষি কাজের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল। যাদের জমিজমা ছিল তারা সরাসরি চাষ করতো এবং সেসব কাজে যাদের জমিজমা নেই তারা কমলা খেটে কাজে হেল্প করতো। ধান, গম, আখ, পাট, তিল, সরিষাসহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য চাষ করা হত।



(গরু দ্বারা হালচাষ করা হত)

এসব জিনিস হাটের দিন নালী বাজারে এনে বিক্রয় করতো গ্রামের মানুষেরা। সবজির মধ্যে কাচা মরিচ, পিয়াজ, আলু, পটল, ঢেরস, বেগুন ইত্যাদির গ্রামে চাষ হত এবং নালী হাটে এনে বিক্রয় করতো।



(মরহুম আবু পাগলের ছেলে মোঃ সিদ্দিক নালী বাজারে হাটের দিন সবজি বিক্রি করছে)

গ্রামের কিছু মানুষ মাটি কাটার কাজ করতো। গ্রামের ১০/১৫ জনের একটি দল ছিল, তারা যৌথভাবে বিভিন্ন এলাকায় যেয়ে মাটি কাটতো। তাদের মধ্যে একজন সর্দার থাকতো।

গ্রামের ফলমূল যেমন পেয়ারা, আম, ডাব, আখ ইত্যাদি হকারি বিক্রি করতো কিছু লোক। তারা এসব ফল গ্রাম থেকে নিয়ে কখনও নালী হাটে বা কখন আরিচা ঘাটে গিয়ে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতো।

নৌকা দিয়েও অল্প কিছু লোক জীবিকা নির্বাহ করতো। তারা নৌকা দিয়ে যাত্রীদেরকে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় নিয়ে যেত। কেউ কেউ শখ করেও এসব নৌকা ব্যবহার করতো।

মাছ ধরে বিক্রি করে চলতো অনেক মানুষ। বিভিন্নভাবে নৌকা দিয়ে পদ্মা নদীতে, কখনও ইছামতি নদীতে মানুষরা মাছ ধরে বিক্রয় করতো। মাছ ধরার জন্য কখন বর্শি, কখনও দুয়ারি, কখনও জাল ইত্যাদি দিয়ে মাছ ধরা হত।



(এধরনের নৌকা দিয়ে পেশাদার মাছ ধরার লোকেরা মাছ ধরতো।)

গান গাওয়াও পেশা ছিল ২/১ জনের। যেমন মরহুম আদম আলী গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কখনও কারো বাড়িতে গিয়ে কখন, রাস্তায়, বাজারে বা কখনও ফেরীতে।

জনাব কাজী আব্দুল খালেক এধরনের সকল পেশার লোকদেরকে সহযোগিতা করতেন।

<u>শীত,বর্ষা, গ্রীষ্ম ঋতুতে গ্রামের অবস্থাঃ</u>

শীতকালে সমস্ত গ্রামে এক নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হত। গ্রামের মানুষ শীতের প্রস্তুতি হিসাবে কাথা বানাত। কেউ কেউ রাতে ঘুমানোর জন্য বিছানার নিচে নাড়া বিছিয়ে দিত যাতে বিছানা একটু গরম হয়। বেশির ভাগ মানুষ শীতে কষ্ট করতো। সকাল বেলা রোদ্র উপভোগ করতো। ছেলে-মেয়েরা রোদ্রে বসে পড়াশুনা করতো, বয়স্করা রোদ্য পোহাত শীত নিবারনের জন্য।



(শীতকালে অধিকাংশ মানুষ গরমের পোশাকের মধ্যে মাথায় মাফলার, শরীরে জামপার বা জ্যাকেট জাতীয় পোশাক পড়তো। ছবিটি আমাদের গ্রামের মোঃ জুমাত আলীর।)

এসময় সর্দি, কাশি, ঠান্ডাসহ বিভিন্ন রোগ বেড়ে যেত। কাপড় দিয়ে বানান খেতা, বালিশ দিয়ে রাতে মানুষ ঘুমানোর চেস্টা করতো। একটি অবস্থা যাদের ভাল তারা তুলা দিয়ে লেপ বানিয়ে রাতে গায়ে দিয়ে শীত কমানোর চেষ্টা করতো, তবে এদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। শীতের পোশাক হিসাবে জাম্পাট, মাফলার, মোটা কাথা গায়ে দিত অনেকেই। কেউ কেউ চাদর গায়ে দিত।

শীতে খেজুর গাছ কাটা হত। খেজুরের রস সকাল বেলা যেন সবার প্রিয় পানীয় ছিল। গ্রামের ২/৪ টি পরিবার খেজুরের রস জ্বাল দিয়ে গুড় বানিয়ে নালী বাজারে বিক্রয় করতো। শীতে সমস্ত গ্রাম কুয়াশার চাদরে ঢেকে যেত। কখনও কখনও হাড় কাপুনি শীতও অনুভুত হত। বয়স্ক এবং শিশুদের বেশি কষ্ট হত। তবে শীতের মধ্যে পিঠা খাওয়া, একে-অপরকে দাওয়াত দেওয়ার প্রচলন ছিল। ফুলকপি, বাধা কপিসহ কিছু সবজি শীতে পাওয়া যেত। বর্ষাকালে সম্পর্ণ ভিন্নরুপ দেখা

দিত। সারা গ্রাম পানি দ্বারা প্লাবিত হয়ে যেত। বর্ষা শেষেও কাদামাটি দ্বারা সমস্ত গ্রাম ভরে যেত, চলাফেরায় মানুষদের অনেক কষ্ট হত।



(বর্ষাকালে বিশেষ করে বন্যায় সমস্ত গ্রাম এভাবে প্রায় পানি দ্বারা ডুবে যেত।)

গ্রীস্মকালে প্রচুর গরম পড়তো। এসময় মানুষের অবস্থা শীতকালের সম্পর্ণ বিপরীত অবস্থা হত।

গরম থেকে বাঁচার জন্য তালপাতার তৌরি হাত পাখার কদর বেড়ে যেত। বিদ্যুৎ ছিলনা, ফ্যানের প্রশ্নই আসেনা। সারা গ্রামের মাটি পর্যন্ত প্রচুর গরম হয়ে যেত। এসম অবশ্য আমসহ কিছু ফল পেকে যেত। ঘরে ঘরে আম খাওয়ার পরিবেশ দেখা যেত।

## ঈদ, রোজা, নামাজ ইত্যাদির অবস্থাঃ

বছরে দুইটি ঈদের দিন যেন গ্রামের সম্পর্ণ নতুন পরিবেশ। এই দুই দিন আনন্দের বন্যা বয়ে যেত। ধর্মীয় রীতিনীতিতে অনেক কমতি থাকলেও ঈদের দিনকে সবাই খুব গুরুত্ব দিত।

ঈদের দিন সকালে গ্রামের সবাই ইছামতি নদীতে এসে গোছল করতো। গোছলের সময় সাবান ব্যবহার করতো, নতুন লুঙ্গী পড়তো প্রায় সবাই। ঈদের দিন সকালে ঘরে ঘরে সেমাই, খিচুরী রান্না শুরু হয়ে যেত। আর্থিক অবস্থা যার যত খারাপই হোকনা কেন এই দিনকে সবাই উৎযাপন করতে চাইতে আনন্দের সাথে। পাঞ্জাবি, টুপি, আতর মেখে ছোট বাচ্চা থাকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই সয়দাবাদ মসজিদের ঈদগাহ মাঠে ঈদের নামাজ পড়ার জন্য যেত। তখন সয়দাবাদ মসজিদে যেতে হলে গোয়ালখালী রাস্তা থেকে একটি বাঁশের পুল পার হয়ে সয়দাবাদ মসজিদে যেতে হত। এই পুল পার হওয়া অনেক কস্টের কাজ ছিল। তবুও কেউ ঈদের নামাজ মিস করতে চাইতোনা। ঈদের নামাজ সকাল ৯ টার সময় ঘোষণা করলেও ১০ টা কখন ১১ টা বেজে যেত, কারণ সবাই সময়মত উপুস্থিত হতে পারতোনা। যেহেতু আশেপাশে আর কোন ঈদের নামাজের ব্যবস্থা ছিলনা, কেউ মিস করলে ঈদের নামাজ পড়তে পারবেনা, তাই সবার জন্য অপেক্ষা করা হত। ঈদের নামাজ শেষে টাকা তোলা হত, বলাই মোল্লা, ইমাম সাহেব ও মসজিদের জন্য। এসব টাকা তোলা, গননা করা ও ঘোষণা করা এবং লম্বা সময় মোনাজাতের কারণে দুপুর হয়ে যেত। এছাড়া নামাজের পড়ে কোলাকুলি করা, একে-অপরকে ধরে আবেগে কান্নাকাটি করা ইত্যাদি হত।



(ঈদের দিন গোহাইলবাড়ি গ্রামবাসী, ২০২১ সালের ছবি।)

ঈদের নামাজ শেষে দলবেধে ছেলে-মেয়েরা একেক বাড়িতে খেতে যেত। ঈদের দিন মাতবার বাড়ি অর্থাৎ আফাজউদ্দিন মোল্লার বাড়িতে সবাই সেমাই, খিচুরি নিয়ে একত্রিত হত, সবাই মিলে মিশে এসব খেত।

বিভিন্ন জায়গায় ঈদের আনন্দ হিসাবে লাঠিবাড়ি খেলা, গরুতে গরুতে লড়াইসহ বিভিন্ন আনন্দ আয়োজন হত।

রোজার সময় গ্রামের অল্প কিছু মানুষ রোজা রাখতো। যারা রোজা রাখতো তারা গভীর রাতে উঠে রান্না শুরু করতো। ঘড়ি বা মাইকের আওয়াজ তেমন পাওয়া যেতনা। আন্দাজে প্রায় সবাই সেহরি খেত। ইফতারি হিসাবে মুড়ি, চানাচুর, পিয়াজু খাওয়া হত।

বর্তমানে (২০২৫) গ্রামে মসজিদ হওয়াতে গ্রামের মসজিদের ইফতারির ব্যবস্থা হয়।

গ্রামের প্রায় সব রোজাদার ইফতারের সময় মসজিদে এসে উপুস্থিত হয়। ২০২১ সালে মসজিদে নির্মানের পরে এখন থেকে নিয়মিত মসজিদে ইফতারের ব্যবস্থা হয়। কাজি আব্দুল খালেক এর পক্ষ থেকে প্রতি বছর সবার জন্য ইফতারের আয়োজন করা হচ্ছে।

মসজিদ নির্মানের পরে থেকেই সবাই এখন মসজিদে এসে ইফতার করে।



(গ্রামের মসজিদে ইফতারের ব্যবস্থা, ২০২২ সালের ছবি)

ইফতারি করার জন্য কেউ কেউ দাওয়াত দিত। এসময় গ্রামের মোল্লাকে বিশেষ করে দাওয়াত দেওয়া হত।

নামাজীর সংখ্যা খুবই কম ছিল। হাতে গোনা অল্প মানুষ নিয়মিত নামাজ পড়তো, অধিকাংশ লোক নামাজ পড়তোনা। ২/১ জন ছিল ঈদের নামাজও পড়তোনা। জুমার দিন অল্পকিছু মানুষ নালী মসজিদে গিয়ে জুমার নামাজ পড়তো।

## আমোদ-প্রমোদ

গ্রামের মানুষের মধ্যে দারিদ্রতা থাকলেও সবার মুখে হাসি থাকতো। কথায় কথায় রসিকতা করা, একে-অপরেকে আনন্দ দেওয়া, ছন্দে ছন্দে কথা বলা, সুযোগ পেলে গান-বাজনা ও বিভিন্ন আনন্দে মেতে উঠার অভ্যাস ছিল।

কেউ কেউ রাস্তা দিয়ে হেটে যেত আর মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে চলে যেত। ছোট বাচ্চারা ফুটবল, হাডুডু, কানামাছি, চোর পুলিশ, গোল্লাছুটসহ বিভিন্ন খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকতো। জাম্বুরা দিয়ে বল বানিয়ে খেলতো অনেকেই। সবসময় কোননা কোন খেলাধুলায় বা আনন্দে থাকতো সবাই। লুডু খেলার প্রচলন ছিল প্রায় ঘরেই।



(এই ছবিটি ২০২১ সালে গ্রামের ছেলেদের, এরা ক্রিকেট খেলার জন্য গ্রামের পাশে থাকা কাজি আব্দুল খালেক রতন এর জায়গায় ক্রিকেট খেলতে এসেছে।)

সবচাইতে বেশি আনন্দ ছিল টিভিতে ছবি বা নাটক দেখার মধ্যে। গ্রামের মধ্যে বাবুল সাহা এর বাড়িতে একমাত্র টিভি ছিল। সবাই ঐ বাড়িতে মাসে একদিন টিভি দেখার জন্য যেত। তখন বিটিভিতে প্রতি মাসে ১ বার একটি ছবি প্রদর্শিত হত। বিকাল ৩ টার দিকে এই ছবি শুরু হত, শেষ হতে হতে সন্ধ্যা হয়ে যেত। ব্যাটারি দিয়ে টিভি চালান হত।



(এভাবে সবাই একসাথে বসে টিভিতে বাংলা ছায়াছবি দেখতো।)

ব্যাটারি চার্জ দেওয়া ব্যয় বহুল ছিল। টিভি কেনার সামর্থ্য ছিল কেবল তাদেরই ছিল অর্থাৎ গ্রামের মধ্যে বাবুল সাহা এবং খালের উত্তর পারে মোঃ বাবলু(নইজদ্দিন এর ছেলে, সাদ্দামের বাবা) ছিল। এই দুই বাড়ি এবং মোঃ কুদ্দুসের বাবা জুমাত আলী মেম্বারের বাড়িতে টিভি ছিল। অর্থাৎ গ্রামের মধ্যে বাবুল সাহা এর বাড়ি, গ্রামের উত্তর পাশে খালের ঐপারে মোঃ বাবলু এবং জুমাত আলী মেম্বার বাড়িতে টিভি ছিল।

কেউ কেউ খাল পার হয়ে ঐ দুই বাড়ি গিয়ে টিভি দেখতো। সপ্তাহে ১ দিন নাটক হত, রাত ৮ টার সংবাদের পরে।

এরপরে গ্রামের আরো দুইবাড়িতে টিভির ব্যবস্থা হয়। জলিল মোল্লার বাড়ি (মাসুদ, শাহ আলমের বাবা) এবং মোঃ আদমের ছেলে নওশের আলীর বাড়ি।

টিভি দেখার জন্য মাসে একদিন সবাই অস্থির হয়ে থাকতো। বিকাল হলেই সবাই এই কয়েক বাড়ির কোন এক বাড়িতে গিয়ে টিভি দেখতো। রাতের বেলা নাটক হত, কেউ নাটক মিস করতে চাইতোনা। সবাই ছবি দেখে বা নাটক দেখে একে-অপরের সাথে কাহিনী নিয়ে আলাপ করতো।

গ্রামের ২/৪ টি বাড়িতে রেডিও ছিল। রেডিওতে সাধারণত খবর শোনা ও গান শুনা হত। বাংলাদেশ বেতার থেকে নিয়মিত খবর, গান ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার হত। রেডিওতে এসব শোনার জন্যও বহু মানুষ একত্রে বসে মনোযোগ সহকারে বসে থাকতো।



( এই ধরনের রেডিও গ্রামের মধ্যে হাতে গোনা ২/১ জনের বাড়িতে পাওয়া যেত। )

গ্রামের মধ্যে যাত্রা হত আবু পাগলার বাড়িতে বছরে একবার।

এছাড়া নালী বাজারেও যাত্রা হত রাতের বেলা-এসব দেখার জন্যও মানুষেরা উৎসুক ছিল। কিছু কিছু বাড়িতে মারফতি গান, লালন শাহের গানের আয়োজন হত। কিছু কিছু বাড়িতে পীরদের আগমন ছিল।

এরমধ্যে অনেক ভন্ড পীরও ছিল, তারা মারফতের পীর বলে দাবি করতো। খুব সুন্দর করে মনোমুগ্ধকর কথা বলে মানুষদেরকে বিমোহিত করতো। গ্রামের মধ্যে ঘর জামাই থাকার প্রচলন ছিল, কারণ গ্রামের মানুষ খুব নীরিহ ছিল, পরস্পর মিলে মিশে চলতো। গীবতের খুব প্রচলন থাকলেও সরাসরি সহজে কেউ কারো সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হতনা।

গ্রামের ছেলে-মেয়েরা খেলা ধুলা করতে খুব পছন্দ করতো। সারাদিন বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলায় লিপ্ত থাকতো।



(সুপারি গাছের পাতা দিয়ে এভাবে বসে আনন্দ করা হত)



(এই খেলাগুলো প্রায় সারাদিন শিশুদের মধ্যে চলতে থাকতো।)

সারাদিন আনন্দে কাটাতো ছোটরা। (এসব খেলাধুলা এখনও কিছুটা প্রচলন আছে, তবে দিন দিন কমে যাচ্ছে।) বড়রা তাস খেলা, হাডুডু খেলাসহ বহু ধরনের খেলাধুলা করতো।

খাদ্য অভ্যাস, পোশাকঃ ডাল-ভাত, মাছ, আলু ভর্তা, বিভিন্ন শাক সবজি এলাকায় এমনিতেই জন্ম নিত যেমন, কচু, কলার থর ইত্যাদি

গ্রামের মানুষের প্রধান খাবার ছিল ভাত, মাছ। এছাড়া গমের রুটিও পাওয়া যেত। প্রচুর মাছ পাওয়া যেত নদীতে ও খালে।



(এধরনের মাছ খালে, বিলে নদীতে পাওয়া যেত)



এগুলি সাধারণত স্বাদুপানির মাছ, যা নদী, খাল, বিল, হাওর এবং পুকুরে পাওয়া যেত এখনও যায়। কিছু জনপ্রিয় দেশি মাছের উদাহরণ হল: রুই, কাতলা, মৃগেল, চিতল, আইড়, ইলিশ, বোয়াল, পাবদা, গুলশা, টেংরা, কই, শিং, মাগুর, টাকি, পুঁটি, মলা, ঢেলা, বাইম, চেলা, ফলি, চিংড়ি, ইত্যাদি।

আলু ভর্তা কাচা মরিচ, পিয়াজ ও লবন দিয়ে-এটাও কমন ছিল। গ্রামের প্রচুর শাক সবজি বাড়ির আশে পাশেই জন্মাত। যেমন, কচু শাক, লাউ শাক, পুঁইশাক, ডাটা শাক, কলমি শাকসহ প্রচুর শাক সবজি পাওয়া যেত। এছাড়া গ্রামের পশ্চিমে চকে বিভিন্ন শাক তুলে এনে গ্রামের মানুষ খেতে।

বাড়ির আশে পাশে কাঁচামরিচ, আলু, বেগুন, ঢেঁড়স, পেঁপে লাগাত অনেকেই যার ফলে ঘরে সবজির চাহিদা মিটে যেত।

গরুর দুধ, বকরীর দুধ, হাঁস মুরগীর ডিম ইত্যাদি প্রায় বাড়িতেও পাওয়া যেত।



(গ্রামের অধিকাংশ পরিবারের মানুষ এসব প্লেটে খানা খেত)

<u>গোহাইলবাড়ি গ্রামের আশে-পাশের উল্লেযোগ্য বাজার, স্কুল, ইছামতি নদী, পদ্মা নদী, সয়দাবাদ মসজিদ, ও কয়েকটি গ্রামের অবস্থাঃ</u>

গোহাইলবাড়ি গ্রাম মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় থানায় উলাইল ইউনিয়নে অবস্থিত। এই গ্রামের পূর্বে ইছামতি নদী, তারপরে দড়ি কয়রা গ্রাম, রূপসা এলাকা। পশ্চিমে বিরাট চক, তারপাশে শিবালয় ইউনিয়নের দাশকান্দি, ধুতরাবাড়ি,

অম্বয়পুর, এলাচিপুর, আরিচাঘাট। উত্তরে গোয়ালখালী, সৈয়দাবাদ, কাচারীঘাট থেকে উখুলী পর্যন্ত। দক্ষিনে নালী, তিলোচান পট্টি, পাটুরিয়াঘাট।

এই গ্রামের আশে পাশে উল্লেখ যোগ্য স্থানঃ

নালী বাজারঃ গোহাইলবাড়ি গ্রামের মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র কেনা-বেচার জন্য এই নালী বাজারই একমাত্র সম্বল। এই বাজার একসময় খুব ব্যস্ত ছিল, বিশেষ করে হাটের দিন।



(নালী বাজারে সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে সোমবার ও বৃহস্পতিবার)

কাচারীঘাট বাজারঃ গোহাইলবাড়ি গ্রামের উত্তরে গোয়ালখালী গ্রামের পাশে এই কাচারীঘাট বাজার অবস্থিত। এই খানে খুব সকালে বাজার বসে।

রুপসা বাজারঃ নালী বাজারের মতন রুপসা বাজারও অনেক বড় এবং প্রচুর দোকান পাট রয়েছে।

পাটুরিয়া ঘাটঃ পাটুরিয়া ঘাটে বর্তমানে ফেরীসহ, প্রচুর গাড়ির আসা যাওয়া রয়েছে। কারন, এখান থেকে সরাসরি ঢাকা মহাসড়ক। এছাড়া ফেরী ঘাট হওয়াতে দক্ষিন অঞ্চলের মানুষ এই ঘাট দিয়ে ফেরী বা লঞ্চে পার হয়ে যাতায়াত করে।



(পাটুরিয়া ফেরী ঘাট ২০২৫ সাল)



(পাটুরিয়াঘাট ১৯৯০/৯২ সাল)

নালী হাই স্কুলঃ এই এলাকার সবচাইতে পুরোনো একমাত্র হাইস্কুল এই নালী হাই স্কুল।




(গোহাইলবাড়ি গ্রামসহ প্রায় সবাই এই হাই স্কুলে পড়াশুনা করে।)

নালী প্রাইমারি স্কুলঃ নালী প্রাইমারি স্কুল নালী হাই স্কুলে সাথে লাগানো পশ্চিম পাশে অবস্থিত।

রুপসা হাই স্কুলঃ এই হাই স্কুলও নালী হাই স্কুলের মত সুনামের অধিকারি এবং বহু ছাত্র/ছাত্রী এই স্কুলে পড়াশুনা করেন।



(রুপসা হাই স্কুল, ২০২৫ সাল)

ইছামতি নদীঃ গোহাইলবাড়ি গ্রামের পূর্ব পাশে দিয়ে বয়ে গেছে এই নদী। উখুলী থেকে আমডালা, কয়রা, সয়দাবাদ, গোয়ালখালী হয়ে নালী, রুপসা, নয়াকান্দি হয়ে চলে গেছে দক্ষিন পূর্ব দিকে।



(ইছামতি নদী)

পদ্মা নদীঃ গোহাইলবাড়ি গ্রাম থেকে ৪/৫ কিলোমিটার দক্ষিনে অবস্থিত এই পদ্মা নদী।



(পদ্মা নদীতে এভাবে নৌকা দিয়ে জাল ফেলে ইলিশ মাছ ধরা হত, এখনও হয়, ছবিটি ১৯৯০/৯২ সালের)

সৈয়দাবাদ মসজিদঃ গোহাইলবাড়ি গ্রামের মানুষ একসময় ঈদের দিন এই মসজিদে এসে নামাজ আদায় করতো। বর্তমানে নিজ গ্রামে মসজিদ হওয়াতে এখন আরে আসেনা। এই মসজিদের পাশে শাহ সুফীর মাজার রয়েছে। সবাই তাকে শাহ ছাহেব বলে। কেউ কেউ মানত করে এই মাজারে।

গোয়ালখালী গ্রামঃ গোহাইলবাড়ি গ্রামের উত্তর পাশে অবস্থিত এই গোয়ালখালী গ্রাম। এই গ্রামের মানুষ বেশিরভাগ মানুষ কৃষিকাজের সাথে জড়িত।

নালী গ্রামঃ গোহাইলবাড়ি গ্রামের দক্ষিনে অবস্থিত এই নালী গ্রাম। এই গ্রামকে কেন্দ্র করেই গোহাইলবাড়ি গ্রামের মানুষের সকল কাজ পরিচালিত হয়। যদিও গোহাইলবাড়ি উলাইল ইউনিয়নে অবস্থিত আর নালী গ্রাম আরুয়া ইউনিয়নের মধ্যে অবস্থিত।

দড়ি কয়ড়া গ্রামঃ গোহাইলবাড়ি গ্রামের পূর্বে নদীর ওপারে অবস্থিত এই দড়ি কয়রা গ্রাম। এই গ্রামে কোন হিন্দু নেই, সবাই মুছলমান। এই গ্রামের মরহুম গোলাম শফির বাড়িতে থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মোল্লা গোহাইলবাড়ি গ্রামের মোল্লার কাজ পরিচালনা করতো যেমন মরহুম মোঃ হজ্জ মোল্লা, বর্তমানে মোঃ ফাইজদ্দিন মোল্লা।

গোহাইলবাড়ি গ্রামের বর্তমান (২০২৪) অবস্থাঃ

১। ভৌগিলিক অবস্থাঃ গোহাইলবাড়ি গ্রামে একসময় সামান্য বৃষ্টিতে চলাফেরা কষ্ট হত। কারন সারা গ্রামে এটেল মাটি, গ্রামের ভিতরে রাস্তা বা হালট ছিল খুব নিচু। বর্তমানে হালট অনেক উচু থাকাতে আর সহজে পানি জমেনা, এমনকি বর্ষাকালেও তেমন সমস্যা হয়না।

গ্রামের পশ্চিমে পাটুরিয়া উথুলী মহাসড়ক হওয়াতে পানি এই গ্রামে সহজে প্রবেশ করতে পারেনা।




(গোহাইলবাড়ি গ্রামের পশ্চিমে অবস্থিত পাটুরিয়া থেকে ঢাকা মহাসড়ক)

এছাড়া নালী থেকে গোয়ালখালী পর্যন্ত রাস্তা পর্যাপ্ত উচু এবং পাকা হওয়াতেও গ্রামের মধ্যে বন্যায় পানি প্রবেশ সহজে না করাতে এখন আর তেমন ভোগান্তি পোহাতে হয়না।



(নালী বাজার থেকে গোয়ালখালির দিকে চলে গেছে এই সড়ক। এর পশ্চিমে গোহাইলবাড়ি গ্রাম অবস্থিত। এই সড়কটি পূর্বে এত উচু ছিলনা কিন্তু বর্তমানে উচু এবং মুজবত হওয়াতে গ্রামে বন্যা বা বর্ষার পানি সহজে প্রবেশ করতে পারেনা)

গ্রামে রয়েছে প্রচুর গাছপালা যা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রাখার জন্য জরুরী।



(জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন এর দানকৃত ৪ তলা বাড়ির ছাদ থেকে তোলা গোহাইলবাড়ি গ্রামের উপরের ছবি)

২। বাড়ি ঘরঃ বর্তমানে এই গ্রামে হাতে গোনা ১০/১২ টি বাড়ি ছাড়া প্রায় বাড়িই টিনের এবং নিচে ইটের গাঁথুনি দ্বারা নির্মিত। বাঁশের চটা দিয়ে বা ছনের ঘর নেই বললেই চলে।

৩। শিক্ষাঃ  প্রতিটি ঘরের ছেলে মেয়ে বর্তমানে স্কুলে যায়, পড়াশুনা করে। শিক্ষার হার দিন দিন উন্নতি হচ্ছে।




(২০২১ সালে মসজিদ নির্মানের পরে মসজিদ থেকে আল-কুরআন ও সুন্নাহ এর শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা চলছে)

৪। পেশাঃ কৃষি কাজের পাশাপাশি বর্তমানে চাকুরি, দোকান-পাট, খামার বানিয়ে গরু, মুরগী পালন ইত্যাদি পেশার মানুষ সৃষ্টি হচ্ছে। গ্রামের সেইসব ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনা করে বর্তমানে ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত রয়েছে।

৫। মসজিদঃ গ্রামের মানুষেরা যাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সহজে পড়তে পারে এবং আল-কুরআন সুন্নাহ এর সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে এইজন্য গ্রামে ২০২১ সালে মসজিদ নির্মান করা হয়েছে। গ্রামের যুবকরা এই মসজিদ নির্মানে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছে। মসজিদকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর ওয়াজ মাহফিলের আয়োজনের চেস্টা চলছে।



(গোহাইলবাড়ি জিরাতুননেছা জামে মসজিদ)

মসজিদ নির্মানের পর থেকে গ্রামে পরিবর্তন শুরু হয়েছে।



(গোহাইলবাড়ি যুবক ও গ্রামবাসির উদ্যোগে মাহফিল হচ্ছে প্রতি বছর, মাহফিল-২০২২ এর ছবি)

৬। ইসলামিক আকিদাঃ গ্রামে মসজিদ হওয়াতে যেমন সবাই সহজে নামাজ আদায় করতে পারছে, একইভাবে জুমার বয়ান ও আলেমদের আসা যাওয়ার কারনে সহিহ আকিদা দিন দিন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। ধর্মীয় কুসংস্কারসহ, শির্কি ও বিদআত আকিদা থেকে মানুষ সঠিক পথে আসার চেস্টা করছে।

আল-হামদুলিল্লাহ, দারিদ্রতা দূর করে শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামিক সহিহ আকিদা প্রতিষ্ঠার পিছনে জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন এর অবদান রয়েছে।

গোহাইলবাড়ি গ্রামে বর্তমান আছেন এমন ব্যক্তিদের কাজি আব্দুল খালেক (রতন) এর তৎকালীন নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে ইন্টারভিউঃ

ইখলাছ উদ্দিনঃ জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন যখন গ্রামের মানুষের জন্য কাজ শুরু করেন তখন ইখলাছ উদ্দিন তাঁর বাড়িতে বসবাস করতেন।




(ছবিতে প্রদর্শিত ৩ ব্যক্তির মধ্যে প্রথম জন মরহুম মোঃ গোলাম শফি, মাঝের জন্য মোঃ ইখলাছ উদ্দিন এবং ৩য় জন মোঃ জুমাত আলী। মোঃ ইখলাছ উদ্দিন ১৯৯০/৯২ সালে গ্রামের মানুষদেরকে হেল্প করার জন্য জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন এর কাছে গ্রামের মানুষের অবস্থা তুলে ধরতো।)

মোঃ হারুনঃ যারা গ্রামের মানুষের মধ্যে সহযোগিতা পেয়েছিলেন তাঁর মধ্যে অন্যতম মোঃ হারুন। উনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সাহায্য পেয়েছেন এবং নিজে পরামর্শ করেও অন্যকে সহযোগিতা করেছিলেন জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন থেকে। বর্তমানে আগের চাইতে অবস্থা তুলনামূলক ভাল।




বিনাত মোল্লাঃ গ্রামের বয়স্ক মুরুব্বীদের মধ্যে উনি এখনও জীবিত আছেন। উনিও বিভিন্ন সময় জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন থেকে সহযোগিতা পেয়েছেন। নিজের একমাত্র ছেলে এখন কর্মক্ষম, অবস্থা আগের চাইতে ভাল।




(২০১০ সালে তোলা ছবিতে বিনাত মোল্লা)

জুলুমদ্দিনঃ বহু ধরনের সহযোগিতা পেয়েছেন এই ব্যক্তি জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন থেকে।

নিজের স্ত্রী অসুস্থতার সময়, ঘর তোলার জন্য টিন, নিজের মেয়ের বিয়ের সময় সহযোগিতাসহ বিভিন্ন রকমের সহযোগিতা পেয়েছিলেন তিনি।



আব্দুস ছালাম মোল্লাঃ মরহুম আব্দুস ছাত্তার মোল্লার ছেলে মোঃ আব্দুস ছালাম। বর্তমানে আর্থিক অবস্থা ভাল, সরকারি জব করেন।



মোঃ নজরুল ইসলাম মিঠু মোল্লাঃ মরহুম মোঃ আফাজ উদ্দিন মোল্লার ছেলে মোঃ নজরুল ইসলাম মিঠু মোল্লা।



(মোঃ নজরুল ইসলাম মিঠু মোল্লা ২০২২ সালে গ্রামের মসজিদে থেকে জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন এর দেওয়া হাদিয়া তুলে দিচ্ছেন শিক্ষার্থিদের হাতে)

মোঃ আব্দুল খালেক বাচ্চু মোল্লাঃ



(মোঃ আব্দুল খালেক বাচচু মোল্লা ২০২২ সালে গ্রামের মসজিদে থেকে জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন এর দেওয়া হাদিয়া তুলে দিচ্ছেন শিক্ষার্থিদের হাতে)

সেলিম মোল্লাঃ মরহুম মোঃ চুন্নু মোল্লার ছেলে মোঃ সেলিম মোল্লা।



(মোঃ সেলিম মোল্লা বর্তমানে নালী বাজারে বিজনেজ করেন)

আক্কাছ আলীঃ



(এই ছবির মধ্যে হলুদ রঙের জামা পরিহিত মোঃ আক্কাছ আলী, যিনি আল-কুরআন হাদিয়া নিচ্ছেন তাঁর পিছনে)

মেহেদী হাসানঃ



(মোঃ মেহেদি হাসান বর্তমানে পোল্ট্রি ফার্মের বিজনেজ করেন, ছোট বেলায় পড়াশুনা চলাকালীন হেল্প পেয়েছিলেন কাজি আব্দুল খালেক রতন থেকে।)

রেজ্জাক আলীঃ



(ঝালমুড়ি বিক্রয় করছেন মোঃ রেজ্জাক আলী, ছবিটি ২০২৩ সালে ঈদের দিন)

ফজল হোসেনঃ



(মোঃ ফজল হোসেন, বর্তমানে ঢাকায় জব করেন, পাশাপাশি গ্রামে বিজনেজ করেন)

ছকেল মোল্লা মাদবারঃ




(ছকেল মোল্লা মাতবার স্মরণ করছেন সেইসব দিনের কথা যখন উনিসহ গ্রামের মানুষ খুব অভাবি ছিল।)

আক্কাছ আলী (নালি বাজার)




(মোঃ আক্কাছ আলী, নালি বাজারে ডাক্তারি করেন। তিনি জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন থেকে সুদবিহীন লোন নিয়ে উপকৃত হয়েছিলেন।)

বর্তমান সময়ে দায়িত্ব পালনকারীঃ মোঃ জুমাত আলী, মোঃ আব্দুল আলিম, মোঃ মামুন মোল্লা  শফি (ইখলাছ উদ্দিনের ছেলে)

মোঃ জুমাত আলীঃ বর্তমানে (২০২৫) জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন এর ব্যাংকার হিসাবে দায়িত্ব পালনকারি জনাব মোঃ জুমাত আলী।




(মোঃ জুমাত আলী মেম্বার, তিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে কথা বলছেন, ২০১৪ সালে তোলা ছবি)

মোঃ আব্দুল আলিমঃ উনিও কিছুদিন ব্যাংকার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।




(মোঃ আব্দুল আলিম নালী বাজারে দোকান চলাকালীন সময়ে ব্যাংকার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন)

মোঃ মামুন মোল্লা শফিঃ মানুষের তাৎক্ষনিক প্রয়োজনে বর্তমানে যিনি জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন এর পক্ষ থেকে কাজ করছেন তিনি হলে মোঃ মামুন মোল্লা শফি। মোঃ ইখলাছ উদ্দিনের ছেলে এই মোঃ মামুন মোল্লা শফি।



(মোঃ মামুন মোল্লা শফি, গ্রামের মানুষের প্রয়োজনে তাৎক্ষনিক সহযোগিতা করছেন)

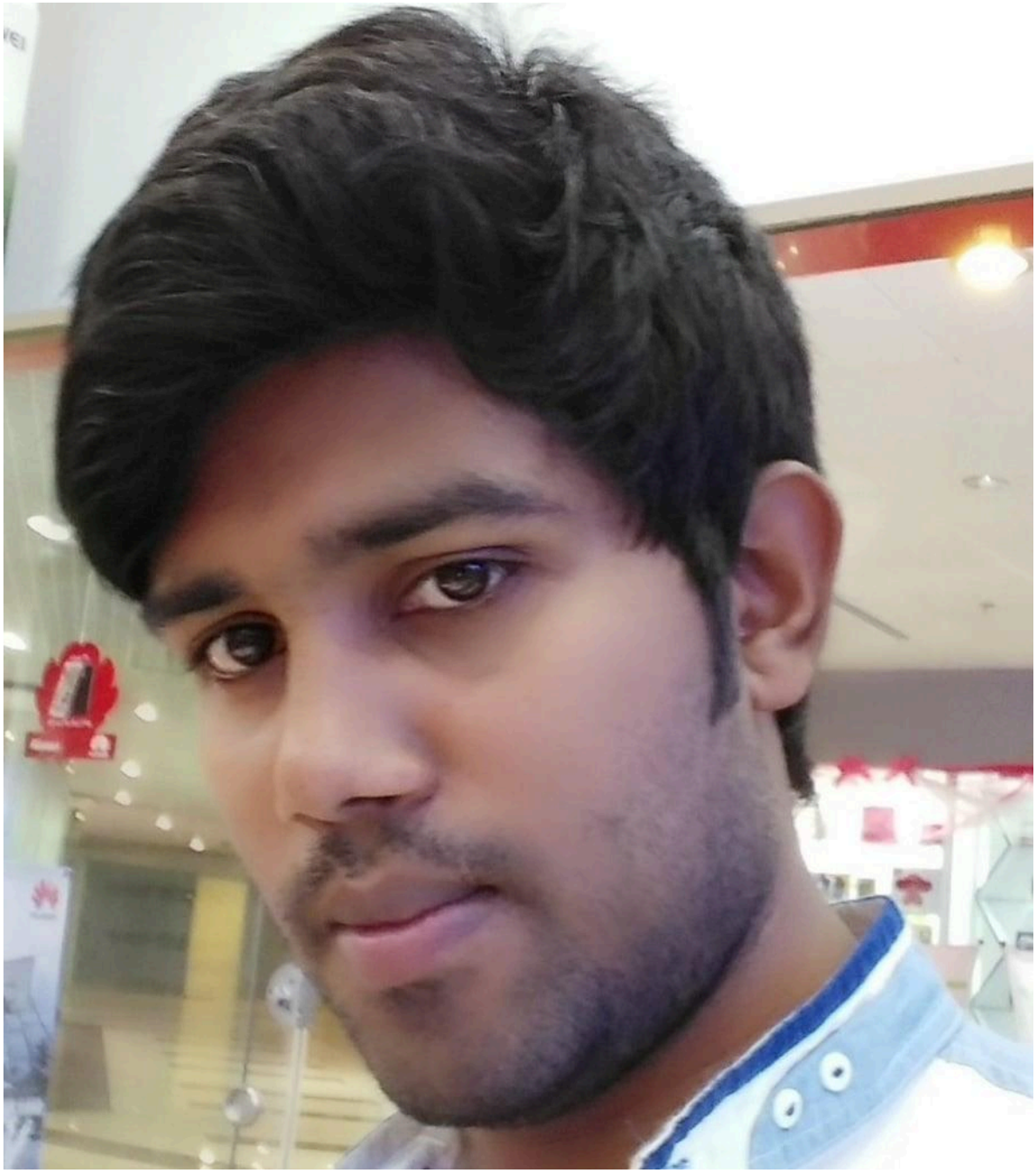
কাজি আব্দুল খালেক (রতন) থেকে সাহায্য নিয়ে উপকৃত হয়েছে এমন গোহাইলবাড়ি গ্রামের বিভিন্ন যুবকঃ

নাসির উদ্দিনঃ গোহাইলবাড়ি গ্রামের যুবকদের মধ্যে আর্থিক অবস্থায় সবচাইতে ভাল অবস্থায় আছেন। .



মোঃ নাসির উদ্দিন ঢাকায় বিজনেজ করেন, একসময় পড়াশুনার জন্য হেল্প পেয়েছিলেন জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন থেকে।

মোঃ জসিম উদ্দিনঃ



জসিম উদ্দিন বর্তমানে ঢাকাতে বিজনেজ করেন, যখন স্কুলে পড়াশুনা করতেন তখন জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন।

মোঃ শহীদুল ইসলামঃ



(মোঃ শহীদুল ইসলাম, মরহুম মোঃ মোহন মোল্লার ছেলে, বর্তমানে ঢাকা জব করেন।)

মোঃ আলমগীর হোসেনঃ




(গোহাইলবাড়ি গ্রামের ২০১০ সালের ছবি, ছবিতে মোঃ আলমগির হোসেন দাড়িওয়ালা লোকটির পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন। এরা সবাই জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন থেকে সহযোগিতার জন্য এসেছিলেন।)



(মোঃ আলমগীর হোসেন বর্তমানে বিজনেজ করেন, আর্থিকভাবে ভাল অবস্থায় আছেন।)

এরকম গ্রামের প্রায় সবাই বর্তমানে আর্থিকভাবে তুলনামূলক ভাল অবস্থায় আছেন।

গোহাইলবাড়ি গ্রামের বাইরেও বহু মানুষ জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন থেকে উপকৃত হয়েছেন।

গোহাইলবাড়ি গ্রামের বাইরের কিছু মানুষ যারা জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন থেকে উপকৃত হয়েছেনঃ




(সরাসরি নিজের সমস্যার কথা বলে সুদবিহীন লোন নিচ্ছেন গ্রামের মানুষ)



(নিজের সমস্যার কথা সরাসরি বলা যেত জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন এর কাছে)




(মুখের কথা শুনে তাৎক্ষনিক লোন দিতেন তিনি)



(সুদবিহীন লোন পেয়ে উপকৃত হয়েছেন এরকম বহু মানুষ)




(নিজে উপকারের কথা স্বীকার করছেন এসব সাধারন মানুষ)



( সুদবিহীন লোন যেন আশার আলো)



(নিজের ব্যবসার জন্য সুদবিহীন লোন নিয়ে উপকৃত হয়েছেন এরকম বহু ক্ষুদ্র উদোক্তা)




(একেক জনের একেক ধরনের সমস্যা, সবার আশা-ভরসার জায়গা জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন)




(গোহাইলবাড়ি গ্রামের বাইরেও বহু মানুষ সুদবিহীন লোন পেয়ে উপকার পেয়েছেন)




(সবাই এক বুক আশা নিয়ে জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন এর কাছে এসেছেন।)




(গোহাইলবাড়ি গ্রামের জন্মান্ধ লাভলু, যাকে জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন সহযোগিতার পাশাপাশি ভালবাসতেন)




(সুদবিহীন লোন যেন ব্যবসায় দ্রুত উন্নতি, দড়ি কয়রা গ্রামের এই ব্যক্তি সেই কথাই বলছেন)



(যার যা প্রয়োজন সবাই নিজের সমস্যার কথা বলার জন্য উপুস্থিত হয়েছেন, ২০১০ সালের ছবি)

এভাবে প্রায় আমাদের দেখা ১৯০০/৯২ সাল থেকে একটি গ্রামের পিছনে অনবরত বিভিন্নভাবে হেল্প করে একটি ভারসাম্য অবস্থায় নিয়ে আসার চেস্টা করেছেন এই জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন। একসময় এই গ্রামে অভাবের তাড়নায় সব সময় চিন্তিত থাকতে হত, সকালে কিছু খেলে দুপুরে কি খাবে সেই কথা ভাবতে হত, রাতের বেলায় কিস্তির ভয়ে ঘুম হতনা অনেকের- সেই গ্রাম ধীরে ধীরে একটু স্বাবলম্বীর দিকে আসছে। ঝর বৃষ্টিতে ঘরের চাল উড়ে যেত, শীতের কষ্ট নিবারনের জন্য ঘরের মেঝেতে শুকনো খড় বিছানো হত, বন্যায় বাড়ি ঘর পানিতে ডুবে যেত এবং বেকার হয়ে পড়তো অধিকাং মানুষ খুব সহজেই।

একদিনে খাদ্যঅভাব, অন্যদিকে বাসস্থানের সমস্যা, পাশাপাশি প্রাকৃতিক দূর্যোগ, শিক্ষা, সু চিকিৎসার অভাব বিদ্যমান ছিল অধিকাংশ মানুষের মধ্যে। হাতে গোনা অল্প কিছু লোক ছাড়া সবাই এই সমস্যার সম্মুখীণ হয়েছিল।

জনাব কাজি আব্দুল খালেক রতন মনে করেন, যে কেউ যদি একটু হোচট খেয়ে পড়ে যায় আর অন্য কেউ যদি তাকে উঠে দাড়ানোর জন্য হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে ঐ ব্যক্তি সহজেই উঠে দাড়াতে পারবে এবং চলাফেরাও করতে পারবে। তিনি বলেন, আমি শুধু হাত বাড়ানোর চেস্টা করেছি, বাকিটা আসলে উনারা নিজেরাই স্বাবলম্বী হওয়ার চেস্টা করেছেন। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তারা উন্নতি করেছেন, এখনও অভাব যায়নি, এখনও আরো চেস্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

গোহাইলবাড়ি গ্রামের এত দীর্ঘ সময়ে উন্নয়নের জন্য লেগে থাকার পিছনে কারণঃ

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

আগামী ২০ বছর পরে গোহাইলবাড়ি গ্রাম সম্পর্কে স্বপ্নঃ

ব্যক্তিগত তথ্যঃ

জন্মঃ (০৮-০৩-১৯৫৫)

পড়াশুনা

মুক্তিযুদ্ধে অবদানঃ

ভাই-বোনঃ

পিতা-মাতাঃ

গোহাইলবাড়ি গ্রামের স্মৃতিঃ

কাজী পরিবারঃ

ঢাকার বাসা সম্পর্কে স্মৃতিঃ

লন্ডনে গমনঃ

বিয়েঃ

পেশাঃ

গ্রাম সম্পর্কে লন্ডনে বসে পরিকল্পনাঃ

জীবনের কিছু গুরুত্বপুর্ন ঘটনাঃ

সন্তানাদিঃ

কিছু পরামর্শ নতুন প্রজন্মের জন্যঃ

কিছু পরামর্শ বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন সম্পদশালী লোকদের জন্যঃ

শেষ ইচ্ছাঃ